বৈজু বাওরা ও তানসেন



শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

১৩৩৭

প্রকাশক
শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
দেবনাথপুরা
৺কাশীধাম



প্রিণ্টার :—
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটে
বেনারস-ব্রাঞ্চ



শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য বাহাদুর।

উৎসর্গ-পত্র

সঙ্গীত-প্রেমী প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধুপ্রবর

শ্রীল শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য

রাজাবাহাদুরের করকমলে

ভারতের সনাতন সঙ্গীত-শাস্ত্রের ইতিহাসের মধ্যগগনের চন্দ্র-সূর্য্য

বৈজু বাওরা ও তানসেনের

জীবন-কাহিনী

সাদরে ও সাগ্রহে

অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

বৈজু বাওরার সময় হইতে তানসেনের সময় পর্য্যন্ত যে সকল ঐতিহাসিক বা প্রবাদমূলক ঘটনা এই পুস্তিকায় বিবৃত হইল, উহা অন্য কোন গ্রন্থে আমি দেখি নাই এবং প্রয়াগের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয়ের সাহায্য ভিন্ন আমার দ্বারাও প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। মুক্তাগাছার জ্যেষ্ঠকুমার বাহাদুর শ্রীমান্ জিতেন্দ্র-কিশোর আচার্য্যের অর্থ-সাহায্য না পাইলে গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পন্ন করা আমার মত দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইত। তজ্জন্য আমি উভয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আজকাল নানাপ্রকারে সঙ্গীতচর্চ্চা দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে বটে কিন্তু ধ্রুপদের আদর তেমন দেখা যাইতেছে না। এমন কি, কেহ ধ্রুপদ গান করিতে ইচ্ছুক হইলেও মৃদঙ্গ বাজাইবার লোক পাওয়া যায় না। ইহা কি বিষম পরিতাপের বিষয় নহে? অথচ বোধ হয় যে, এই ধ্রুপদই পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল ও উহা হইতেই নানাপ্রকারে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া অথচ মূল রাগ রাগিণীগণকেই আশ্রয় করিয়া খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে উপকার যাহাই হউক না কেন, আমার মনে হয়, শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট তাল অভ্যাসের ফলে ও চৌতাল প্রভৃতি লম্বা তালের সাধনা না করায়, নাদোপাসনার ফললাভ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইতেছে। ইহাতে তাহাদের ধৈর্য্য, চিত্তের স্থিরতা, মানসিক সাম্য প্রভৃতি জীবনের অতি প্রয়োজনীয় অথচ সাধন-সাপেক্ষ গুণসমূহের লাঘব বা অভাব হইতেছে কি না, ইহাও ভাবিবার বিষয়।

পুস্তকোল্লিখিত ঐতিহাসিক বিষয়গুলির আলোচনা করিতে গেলে দুই একটি সন্দেহ মনে উঠিতে পারে। ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে গায়কগণের বংশপরম্পরা লিপিবদ্ধ না থাকায় প্রবাদ ও অনুমানের উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। গোপাল নায়কের কন্যা মীরার বিবাহ অলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে হইয়াছিল। যদি ঐ ঘটনার তারিখ ১৩১০ খৃষ্টাব্দ ধরা হয়, তাহা হইলে পাঁচ পুরুষে মহম্মদ ঘওসের জন্ম নিম্নলিখিত হিসাবে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে অনায়াসেই সম্ভব হয়—

মীরার বিবাহ—৭১০	হিঃ		বা ইং—১৩১০	
১ পুরুষের জন্ম —৭১৫	,,		,,	১৩১৫
২ ,, ,, (৪০ বৎসর পরে)—৭৫৫ বা			,,	১৩৫৫
৩ ,, ,, ,,		৭৯৫	,,	১৩৯৫
৪ ,, ,, ,,		৮৩৫	,,	১৪৩৫
৫ ,, ,, (৫০ ,,)		৮৮৫	,,	১৪৮৫

ইতিহাসে মহম্মদ ঘওস গোয়ালিয়রীর তারিখ ৮৯০—৯৭০ হিঃ অর্থাৎ ইং ১৪৮৩ (?)—১৫৬২ পাওয়া যায়। আকবর বাদসাহের দরবার সভায় মহম্মদ ঘওস সম্ভবতঃ ১৫৫৭-৫৮ সালে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর ছিল। উক্ত হিসাবে দুই-চারি বৎসর এধার ওধার করিয়া লইলে অলাউদ্দীনের সময় হইতে আকবরের সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ গোপাল নায়কের সময় হইতে তানসেনের সময় পর্য্যন্ত এই গায়ক বংশের একটা মোটামুটি ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়।

কেহ কেহ গল্প করিয়াছেন, ঘেয়াসউদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে অমীর খুসরোর সহিত বৈজু বাওরার সঙ্গীতচ্ছলে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। অমীর খুসরো সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন; বৈজু সঙ্গীতসিদ্ধ ছিলেন। ১২৬৬ সালের কাছাকাছি এই প্রকারের তর্ক-বিতর্ক হওয়া অসম্ভব নহে।

এই প্রকারের আরও অনেক প্রবাদ অনেকের জানা থাকিতে পারে। সকল কথা একত্র করিয়া কোন পণ্ডিত ভবিষ্যতে মুসলমান-যুগের গায়কগণের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিতে পারেন, সেই ভরসায় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। ইহাদ্বারা যদি বর্ত্তমানকালের সঙ্গীতচর্চ্চার প্রসার ও প্রচারের একটুও সাহায্য হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

দেবনাথপুরা,
৺কাশীধাম।
আশ্বিন, ১৩৩৭ সাল।

শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বৈজু বাওরা



প্রাচীন কালের শিক্ষা-পদ্ধতি ও আধুনিক কালের শিক্ষা-পদ্ধতিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ হইয়া গিয়াছে। আজকাল গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল স্থাপিত হইতেছে। কৃষক মাত্রকেই শিক্ষার জন্য একটা অতিরিক্ত রাজকর দিতে হয়। সেই সংগৃহীত কর হইতে রাজা স্কুল করিয়া দিয়াছেন; ক্রমে, দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলিত হইতেছে। এখন শিশুমাত্রকেই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইবে। ঐ সকল স্কুলে ছোট বালক ও শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বেতনে,—এমন কি, চাপরাসী অপেক্ষা অল্প বেতনে—মাষ্টার মহাশয় নিযুক্ত হয়েন। শৈশবের শিক্ষাই ভবিষ্যৎ জীবন ও চরিত্র গঠন করিয়া থাকে কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, ভাবী স্বদেশ-প্রেমিক ও সমাজ-নেতাদের চরিত্রগঠনকারিগণকে অতি দারিদ্র্যে জীবন যাপন করিতে হয়। পূর্ব্বকালে, সংখ্যায় অতি অল্পই বালক লেখাপড়া শিখিত, কিন্তু যাহারা শিখিত, তাহাদিগকে

বেতন দিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে হইত না। বর্ণপরিচয় ও সাহিত্যশিক্ষা অপেক্ষা সংযম, ব্রহ্মচর্য্য ও চরিত্রগঠনের প্রতি শিক্ষকগণ বেশী মনোযোগী হইতেন। সকল দেশেই শিক্ষক-সম্প্রদায় চিরকাল ত্যাগী, দরিদ্র; কিন্তু পুরাকালে তাঁহারা সমাজে যেরূপ সম্মানিত ছিলেন, এখন তেমন নাই। তাঁহারা রাজার কাছে বৃত্তি লইয়া, বা দেশের ধনবান্‌দের কাছে সাহায্য গ্রহণ করিয়া ছাত্রদের অন্ন, বস্ত্র, পুস্তকাদি যোগাইয়া বিদ্যাদান করিতেন, বিদ্যার্থী ছাত্রদের কাছে বেতন স্বীকার করা অতি হীন কার্য্য বিবেচনা করিতেন। ছাত্রেরাও শিক্ষককে পিতা অপেক্ষা বেশী সম্মানীয়, লালন-পালন-কর্ত্তারূপে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিত। এখনকার বিদ্যার্থী ভাবেন, স্কুলে যখন মাসে মাসে বেতন দিতে হয় ও সেই বেতন হইতে মাষ্টাররা বেতন পায়, তখন মাষ্টাররা প্রকারান্তরে বেতনভুক্ চাকরমাত্র। গৃহশিক্ষক সম্বন্ধে প্রায় ধারণা হয় যে, ধনবান্ পিতা, পুত্রের সেবার জন্য যেমন অন্য দুই একটা সেবক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ পড়াইবার জন্য এক মাষ্টার চাকর রাখিয়া দিয়াছেন। অতএব ওরূপ শিক্ষক গুরু না হইয়া চাকর-শ্রেণীভুক্ত হয়।

পূর্ব্বে, কোনও বিশেষ বিষয়ে গুণীরা লোকের কাছে আপনার পরিচয় দিবার সময়ে বাপ-পিতামহের নাম, ধাম বা বংশ-পরিচয় না দিয়া গুরুর নাম বলিত, কাহার কাছে ঐ বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার পরিচয় দেওয়া নিয়ম ছিল।

কোনও বিদেশী বিদ্বান বা গুণী আসিলে লোকে বলিত, অমুকের শিষ্য অমুক আসিয়াছে। গুরুর পরিচয় না দেওয়া বা গুরু অস্বীকার করা মহা অপরাধ বিবেচিত হইত। সমাজ এমন ব্যক্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত ও শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হইত না।

ভারতের বিস্তৃত তীর্থক্ষেত্রের নানাস্থানে ঋষিদের তপোবন, আশ্রম বা টোল ছিল। সেখানে আচার্য্য নানা বিষয়ে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। বিদ্যার্থীরা আপন আপন আচার্য্যের আদর্শে চরিত্র গঠন করিত। অবসর সময়ে আচার্য্য তপস্যা করিতেন। সেই অনুকরণে ছাত্রেরা পূজা-পাঠ ও তপস্যা করিতে শিখিত। তাহাদের ধর্ম্ম শিক্ষা, সংযম শিক্ষা ব্রহ্মচর্য্য পালন ও বিদ্যার্জ্জন সব এক সঙ্গে হইত।

এখন বৃন্দাবন বলিলে মথুরার নিকট একটি ছোট নগর বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রাচীনকালে বৃন্দাবন অর্থে ব্রজভূমি বা ব্রজমণ্ডল ছিল। তাহা ৮৪টি বনে বিভক্ত ছিল। প্রকৃত পক্ষে ঐ ৮৪ বনের এক বনের নাম বৃন্দাবন, কিন্তু বৃন্দাবন শব্দ ব্রজমণ্ডলের জন্যও ব্যবহৃত হইত। বনে, নানাস্থানে ঋষি অথবা আচার্য্যদের তপোবন অথবা আশ্রম ছিল, সেখানে বাস করিয়া তাঁহারা নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। সঙ্গীত তখন ধর্ম্মের ও শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বিবেচিত হইত। শব্দকে ব্রহ্ম বিবেচনা করিলে সঙ্গীত তপস্যার প্রধান অঙ্গ হইয়া যায়।

ঈশাব্দের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে, পশ্চিম দেশ হইতে আগত, মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী তুর্করা রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল কিন্তু দেশে ভারতের পঞ্চধর্ম্ম সম্প্রদায়ের [অর্থাৎ সৌর, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও গাণপত্য] ও বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি শাখা সম্প্রদায়ের তীর্থস্থানগুলি তখনও ভাল অবস্থায় ছিল। দিল্লী তখন মুসলমান সম্রাট্‌দের রাজধানী ছিল। নিকটের কোন কোন মন্দির ভগ্ন করা হইয়াছিল ও সমৃদ্ধিশালী মথুরানগর আক্রমণকারীরা বহু পূর্ব্বে লুট করিয়াছিল বটে, কিন্তু বৃন্দাবন তখনও পূর্ণ গৌরবে বিরাজিত। আগরা তখন সামান্য নগণ্য স্থান, বৃন্দাবন তখন কেবল আধুনিক নগরে সীমাবদ্ধ নহে, বহুবিস্তৃত ৮৪টি বনের সমষ্টি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে বৃন্দাবন বা ব্রজমণ্ডলের কোনও বনে এক সঙ্গীত-সিদ্ধ সাধক পুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার কয়েকটি শিষ্যও ছিল। তিনি সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞরূপে শিক্ষা দিতেন, তবে, বিশেষ প্রতিভাবান ছাত্র না হইলে অন্যস্থানে শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। এই তপস্বীর নাম ছিল ব্রজলাল। কিন্তু তিনি কোন্ দেশবাসী, কি জাতি, কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত, কিছুই জানা নাই। তিনি সর্ব্বদা ভাবে বিভোর থাকিতেন, কাহারও সহিত সাধারণ লোকের মত গ্রাম্য কথা বলিতেন না। সাংসারিকেরা যাহাতে সর্ব্বদা বিরক্ত না করে, সেই জন্য প্রায়ই সাধকগণকে পাগলের মত

ভাণ করিতে দেখা যায়। তিনিও সেইরূপে পাগল সাজিয়া থাকিতেন, অথবা তিনি যথার্থই হরিপ্রেমে পাগল ছিলেন। লোকে তাঁহাকে বৈজু বাওরা অর্থাৎ পাগল বৈজু বলিত। তাঁহার ঈশ্বরদত্ত এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল,—তিনি যে কোনও জীব-জন্তুর ডাকের অবিকল অনুকরণ করিতে পারিতেন। এক দিবস তিনি গভীর বন মধ্যে একাকী বসিয়াছিলেন, তখন এক ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন, তিনিও অনুকরণ করিয়া সেইরূপ গর্জ্জন করিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া ব্যাঘ্র তাঁহার কাছে আসিল। তিনি নির্ভয়ে বসিয়া রহিলেন, অল্প পরে ব্যাঘ্র আবার বনে প্রবেশ করিল। ব্রজলাল সন্দেহ করিলেন, যে, শব্দের কোনও প্রকার আকর্ষণী শক্তি আছে—সেই শক্তিদ্বারা ব্যাঘ্র আসিয়াছিল। তিনি নিঃসন্দেহ হইবার জন্য পরীক্ষাচ্ছলে নানা বন্য জন্তুর ডাকের অনুকরণ করিয়া দেখিলেন, প্রত্যেকবারই যাহার ডাকের অনুকরণ করেন, সে নিকটে আসে।

বৈজু সঙ্গীত বিদ্যাতে উচ্চশ্রেণীর বিদ্বান ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি পশুর ডাকের ঠিক অনুকরণ না করিয়া সেই ডাক যে গ্রামের বা সুরের, সেই গ্রামের অন্য প্রকার শব্দ করিয়া দেখিলেন, তাহাতেও পশু আকৃষ্ট হয়। এই রহস্য আবিষ্কার করিবার পর তিনি গান করিবার সময়ে যখন যে পশুকে ইচ্ছা সঙ্গীত দ্বারা আকর্ষণ করিতেন, সঙ্গীত শুনাইতেন ও মোহিত করিয়া যতক্ষণ ইচ্ছা নিশ্চল পুত্তলীবৎ

বসাইয়া রাখিতেন। এই পশুরা গানের সময়ে এমন মোহিত হইত যে, তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া যাইত। একটি ব্যাঘ্র ও একটি মৃগকে সঙ্গীত দ্বারা একই সময়ে আকর্ষণ করিলে তাহারা আসিয়া উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া গান শুনিত, তাহাদের প্রকৃতিগত খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ভুলিয়া যাইত। বনের অধিবাসীদের বাসস্থান তাঁহার আশ্রম হইতে দূরে হইলেও তাহারা এই দৃশ্য দেখিতে আসিত ও নিজেরা মোহিত হইয়া ব্যাঘ্র, মৃগ ও পক্ষীদের সহিত সমস্ত রাত্রি তাঁহার আশ্রমে কাটাইয়া দিত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে, ১২৯৬ ঈশাব্দে দিল্লীতে অফগান-বংশীয় বৃদ্ধ জলালউদ্দীন ফিরোজ খিলজী সম্রাট্ ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে দিল্লীর তুর্কী সম্রাট্দের সামন্ত ও সেনাপতি ছিলেন। রাজবংশের কেহ না থাকায় সামন্তরা তাঁহাকে সম্রাট্ নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র অলাওউদ্দীনকে তিনি কন্যাদান করিয়া জামাতা করিয়াছিলেন। এই অলাওউদ্দীন তখন কড়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রয়াগ জেলার মধ্যে, আধুনিক এলাহাবাদ নগরের উত্তর-পশ্চিমে, কয়েক মাইল দূরে, গঙ্গার দুই কূলে কড়া ও মাণিকপুর নামক দুইটি নগর আছে, উভয়ের সমষ্টি কড়া-মাণিকপুর নামে খ্যাত। তখন কড়া এ অঞ্চলের শাসনকর্ত্তার প্রধান বাসস্থান ছিল। অলাওউদ্দীন আপনার জ্যেষ্ঠতাতকে হত্যা করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবার

স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু সে উদ্যমের জন্য বিস্তর সৈন্যবলের, অর্থাৎ বহু ধনের প্রয়োজন, তাহা অলাওউদ্দীনের ছিল না। তিনি বাছা বাছা কতকগুলি সৈনিক লইয়া দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন ও প্রকাশ করিলেন যে, তিনি জ্যাঠার সহিত মনান্তর হওয়াতে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যের কোনও রাজার কাছে চাকরির চেষ্টায় যাইতেছেন। তিনি হঠাৎ দেবগিরির যাদববংশীয় রাজাকে আক্রমণ করিয়া বহু ধন লাভ করিলেন। প্রাচীন দেবগিরির নাম মুসলমানদের সময়ে দওলতাবাদ রাখা হইয়াছিল। এখন নিজাম রাজ্য মধ্যে, অওরঙ্গাবাদ হইতে আট মাইল পশ্চিমে, রেলের ধারে দেবগিরির দুর্গের ভগ্নাবশেষটি দেখিবার বস্তু। দেশ-দেশান্তরের ভ্রমণকারিগণ ও দর্শকমণ্ডলী প্রতি বৎসর তাহার পূর্ব্ব গৌরবেব সম্মান করিয়া যায়। প্রয়াগে বা কড়াতে ফিরিয়া আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎকালে নবতিপর বৃদ্ধ পিতৃস্থানীয় জ্যেষ্ঠতাতকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া অলাওউদ্দীন রাজ-সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই সময়ে তিনি দেবগিরিতে উৎপাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশের বিশেষ ক্ষতি করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। রাজ্য লাভ করিবার পরই তিনি গুজরাট ও মহারাষ্ট্র দেশ আক্রমণ করিয়া [১২৯৭-৯৮ঈ.] দেশ ছারখার করিয়া বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করিলেন।

গুজরাট ও মহারাষ্ট্র দেশ লুণ্ঠিত হইলে সেই দেশ হইতে গোপাল নামক একজন সঙ্গীতসিদ্ধ পুরুষ আপনার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে লইয়া, ব্রজমণ্ডলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র-দেশবাসী ছাড়া গোপালের পূর্ব্ব-জীবনের আর কোনও পরিচয় জানা নাই। বৃন্দাবনে আসিবার পর গোপাল প্রায়ই বৈজুর কাছে আসিতেন। উভয়েই সঙ্গীত বিদ্যায় কৃতী; অতএব, অল্প সময়ে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। গোপাল সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীসিদ্ধ ছিলেন, উভয়ের মধ্যে গানে প্রায়ই প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তর বা কথা কাটা-কাটি হইত। গোপাল বৈজুকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সফল না হইয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেন। গোপাল একদিন "খরজ কহাঁ সে……ইত্যাদি" গান করিয়া একটি প্রশ্ন করিলেন। বৈজু তদুত্তরে, "মেহকিস্সুর খরজ……ইত্যাদি" গান করিলেন। অনেক সম্প্রদায়ে নিয়ম ছিল যে, এরূপ প্রতিযোগিতায় পরাজিত ব্যক্তিকে জেতায় শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইত, কোন কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজিত ব্যক্তি জেতার দাস বলিয়া গণ্য হইত ও তাহার প্রাণ-হরণ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা জেতা প্রাপ্ত হইত। হিন্দু ও বৌদ্ধ বিবাদ কালের অনেক গল্প ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, দুই সম্প্রদায়ের দুই জন প্রবল বিদ্বান মধ্যে তর্ক-যুদ্ধ হইত ও পরাজিত ব্যক্তি জেতার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য



বৈজু বাওরা ও গোপাল—৮ পৃঃ

হইত। শঙ্করাচার্য্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত হইয়া তাঁহার প্রধান শিষ্য ও তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর গদী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোপাল এইরূপ প্রশ্নোত্তর-যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বৈজুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু তিনি এই শিষ্যত্ব অপমানসূচক বিবেচনা করিয়া দুঃখিত থাকিতেন ও লোকের কাছে বৈজুকে আপনার গুরুরূপে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এই সময়ে গোপালের স্ত্রী দেহরক্ষা করিলেন। তখন গোপাল আপনার কন্যা মীরাকে লইয়া বৈজুর আশ্রমের নিকটেই এক কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার কন্যাও ধীশক্তিসম্পন্না ছিলেন, অল্পকালে তিনিও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিনী ও যশস্বিনী হইলেন।

এইরূপে পাঁচ ছয় বৎসর কাটিলে, গোপালের এই জনমানবহীন বনে বৈজুর শিষ্যরূপে বাস করা ভাল লাগিল না। তিনি রাজধানী বা অন্য জনবহুল স্থানে স্বাধীনভাবে বাস করিতে উৎসুক হইলেন ও কয়েকটি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গুরুর সম্মান ভোগ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি চাহিলে বৈজু আনন্দিত মনে তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন।

সম্রাট্ অলাওউদ্দীন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। তিনি রাজ্যলাভ করিবার পর যেরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, সেরূপ উন্নতি তাঁহার পূর্ব্বে মুসলমান সম্রাট্দের মধ্যে কেহ করে

নাই। তিনি সিকন্দর সানী অর্থাৎ দ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডর উপাধি ধারণ করিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয়ী সেনা ভারতের দক্ষিণতম সীমা কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ইস্‌লামের আধিপত্যের চিহ্নস্বরূপ একটি মসজীদ রাখিয়া আসিয়াছে, তাহা এখনও তাঁহার শক্তির সাক্ষ্য দান করিতেছে। তাঁহার সময়ে মধ্য এশিয়ার লক্ষ লক্ষ মোগল ও ওজবেকদল কয়েকবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিল. কিন্তু প্রত্যেক বার তিনি তাহাদিগকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজসভাতে এত বিদ্বান, কবি, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, সাধু, সিদ্ধপুরুষ, গুণী, নানা বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ একত্র হইয়াছিলেন যে, সে সময়কার ঐতিহাসিকেরাও আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। গোপাল রাজসভাতে সঙ্গীতজ্ঞদের আদর ও সম্মান দেখিয়া রাজধানী দিল্লীতে গিয়া আসন করিলেন। অল্প কয়েক দিনেই তিনি রাজধানীতে সঙ্গীতে সিদ্ধপুরুষরূপে সম্মানিত হইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার পূর্ব্ব-ইতিহাস জানিত না। তিনি আপনার গুরুর নাম, শিক্ষাস্থান বা পূর্ব্ব বাসস্থান প্রকাশ করিতেন না। ক্রমে তিনি রাজসভাতে, সঙ্গীতসমাজে পরীক্ষা দিতে আহূত হইলেন। সম্রাট্ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নায়ক পদ ও যথোপযুক্ত বৃত্তি দিয়া সম্মানিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার যশঃ দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে তিনি

আপনার গুরুর পরিচয় না দিয়া আপনাকে ঈশ্বর-অনুগ্রহে বা দৈববলে শিক্ষিত ও সিদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিলেন, কিন্তু গুরুর নাম অস্বীকার করায় অনেকে বিরক্ত হইলেন।

বৈজু কিছুকাল পরে, দৈববশে ভ্রমণ উদ্দেশে রাজধানী দিল্লী নগরে আসিলেন। সেখানে আসিয়াই শুনিলেন যে, আর দুই চারি দিবস পরে, কোনও পর্ব্ব-উপলক্ষে সঙ্গীতের বিরাট্ সভা হইবে, সেখানে রাজসভার প্রধান রত্নস্বরূপ গায়ক গোপাল নায়ক সঙ্গীতে আপনার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিবেন। তিনি গোপাল নায়কের বর্ণনা শুনিয়া তাহাকে আপনার প্রাচীন শিষ্যরূপে সন্দেহ করিলেন বটে, কিন্তু ঠিক চিনিতে পারিলেন না। কেননা, গোপাল নায়ক কাহার শিষ্য ও কোথায় শিক্ষিত, তাহা তাঁহার সংবাদদাতারা কেহ বলিতে পারিলেন না। ক্রমে সঙ্গীত-সভার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। বিস্তৃত রাজসভাতে স্বয়ং সম্রাট্ অলাওউদ্দীন সেকন্দর সানী নানা রত্নজড়িত সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া বসিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে রাজবংশীয় কুমারগণ, সভাসদ, সামন্ত ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা বসিলেন। ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিদ্বানমণ্ডলী, কবি, চিকিৎসক, গায়ক, বাদক, ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা, সাধক, ইত্যাদি গুণিসমাজ সমাসীন, একদিকে নাগরিক সাধারণ শ্রোতাদের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন গোপাল নায়কের গান আরম্ভ হইল, তখন এই বিরাট্ সভা

মোহিত হইয়া মৃন্ময় পুত্তলীবৎ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, সভাতে সূচিপতনের শব্দও স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হওয়া সম্ভব ছিল। নিকটেই রাজ-উদ্যানে পালিত মৃগ ছিল, গোপালের এক একটি উচ্চ তান শুনিয়া সেই মৃগগুলি জনপূর্ণতা উপেক্ষা করিয়া সভাতে প্রবেশ করিল ও নিকটে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। মৃগের আকর্ষণ দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে গোপালের গানের সময়ে অনেকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা যে এত জনতা-পূর্ণ স্থানেও আকৃষ্ট হইবে, তাহা কেহ আশা করে নাই। এমন সময়ে, সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন যে, এক জন মলিন জীর্ণ বস্ত্রধারী, কতক পাগলের মত সভাতে নির্ভয়ে প্রবেশ করিল ও গোপালের কাছে গিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "ওয়াহ বেটা, বহুৎ অচ্ছা গায়া" ও নিকটেই বসিয়া পড়িল। গোপাল বৈজুকে সভাতে ঐরূপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত হইলেন, কিন্তু গুরুকে প্রণাম অভিবাদন ইত্যাদি কিছুই করিলেন না। সম্রাট্ আগন্তুকের ব্যবহারে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া গোপালকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু গোপাল গুরু স্বীকার করিলেন না। বলিলেন, "জাহাঁপনাহ্, আমি উহাকে চিনি না, তবে উহার ব্যবহারে বোধ হইতেছে ও আমাকে কোথায়ও দেখিয়াছে। উহার রূপ ও বেশ দেখিয়া একটা পাগল বলিয়া বোধ হইতেছে।" যখন বার বার প্রশ্ন করিয়াও গোপালের কাছে সদুত্তর পাইলেন না, তখন সম্রাট আগন্তুককে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "আপনি কে? আপনি কি গোপালকে পূর্ব্বে চিনিতেন?" বৈজু একটু হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "আমি ভগবানের একজন নগণ্য সেবক মাত্র, এই গোপাল পূর্ব্বে কিছুকাল আমার কাছে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল, উহাকে অনেক দিন দেখি নাই, তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।" সম্রাট্ বুঝিতে পারিলেন যে, গোপাল গুরু অস্বীকার করিতেছে। এ ব্যক্তি যখন নিজেকে গোপালের গুরু বলিয়া পরিচিত করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই ক্ষমতাশালী, সঙ্গীতজ্ঞ ও গুণী হইবে। সম্রাট্ রাগ করিয়া বলিলেন, "গোপাল, সঙ্গীত-সিদ্ধ রূপে তোমার এত অহঙ্কার হইয়াছে যে, তুমি গুরু অস্বীকার করিতে সাহস করিতেছ, এখন তোমাদের গুরু-শিষ্যের বিচার হইবে, সে জন্য প্রস্তুত হও, বিচারে হারিলে তোমার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি প্রাণদণ্ড হইবে।"

বাদশাহের আদেশে গোপাল মুলতান রাগে গান আরম্ভ করিলেন, "দিল্লীপতি নরেন্দ্র সিকন্দরশাহ······ইত্যাদি।" গান শুনিয়া সভাতে একটি হরিণ আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার গলায় একছড়া মালা দিয়া তাহাকে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইল, পরে গান শেষ হইলে হরিণ চলিয়া গেল। সম্রাট্ এইবার বৈজুর দিকে চাহিয়া গান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সাধক বৈজু ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়া একটু হাসিলেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন, "কাল কে আগে কিসী কা নহীঁ চলতা।"

ইহার বহুকাল পরে ভারত-গৌরব ভক্ত কবি মীরাবাঈ এই ভাবটি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন,

করম গৎ টারে নাহি টরে।
যজ্ঞ কিয়ো বলি লেণ ইন্দ্রাসন, সো পাতাল ধরে।
মীরা কে প্রভু গিরধর নাগর, বিষ সে অমৃত করে॥
করম গৎ টারে নাহি টরে॥

বৈজু সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। গোপালও বোধ হয় মনে মনে ভবিষ্যৎ ঘটনার কোনও আভাষ পাইয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন, তথাপি প্রকাশ্যে নিঃশঙ্কে বৈজুর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। বৈজুর সঙ্গীত আরম্ভ হইতেই রাজ-উদ্যানের পালিত নানা প্রকার মৃগ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি ও গগন-বিহারী পক্ষীরা আসিয়া সভাতে একত্র হইল। তন্মধ্যে পূর্ব্বের মালাদ্বারা চিহ্নিত মৃগও ছিল। ক্রমে সঙ্গীতের শক্তি প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। এই বিরাট্ সভার শ্রোতারা, মনুষ্য, পশু, পক্ষীরা মোহিত ও বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া শুনিতে লাগিল। শক্তি চরমে উঠিতেই আঙ্গিনায়-পাতা প্রস্তর দ্রবীভূত (১) হইয়া গেল। তখন বৈজু আপনার

(১) এই ঘটনাকে অনেকে অসম্ভব অত্যুক্তি বিবেচনা করিতে পারেন। কিন্তু সঙ্গীত-সমাজে, বিশেষত ধ্রুপদ সমাজে প্রচলিত প্রবাদ আখ্যানে আপনার রুচি ও ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার আমার নাই বলিয়াই বিশ্বাস করি। সেইজন্য যেমন পাইয়াছি, ঠিক সেইরূপ পাঠককে উপহার দিতেছি। পাঠক আপনার রুচি ও বিশ্বাসমত অর্থ করিয়া লইতে পারেন।—শ্রীঅমৃতলাল শীল।

হাতের তাল [করতাল বা মঞ্জীরা] দ্রবীভূত প্রস্তর আঙ্গনে ফেলিয়া দিলেন ও গান শেষ করিলেন। গান বন্ধ হইতেই প্রস্তর আবার কঠিন হইয়া গেল ও বৈজুর হাতের তাল সেই প্রস্তরে আবদ্ধ হইয়া রহিল। সম্রাট্ এমন শক্তিশালী সঙ্গীত পূর্ব্বে শোনেন নাই ও এরূপ ঘটনাও কখনও তাঁহার সভাতে পূর্ব্বে ঘটে নাই। তিনি গোপালকে বলিলেন "তুমি আপনার সঙ্গীত শক্তির বড় গর্ব্ব করিয়া থাক, এখন সঙ্গীত-বলে প্রস্তর দ্রবীভূত করিয়া ঐ আবদ্ধ তাল তোমাকে উঠাইতে হইবে, না পারিলে তোমাকে অন্যায় গর্ব্বের উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"

গোপাল এবার আপনার পূর্ণবল প্রয়োগ করিয়া গান ধরিলেন, কিন্তু বৈজুর গানে যেমন প্রস্তর দ্রব হইয়াছিল, সেরূপ হইল না। তিনি প্রস্তরে প্রোথিত তাল তুলিতে পারিলেন না। সেকালে এরূপ অপরাধের একমাত্র শাস্তি ছিল শিরশ্ছেদন। আবার শাস্তির কঠোরতা সম্রাটের সে সময়ে কোপের পরিমাণের উপর নির্ভর করিত ; বাঁধা আইন-কানুন কিছুই ছিল না। সম্রাটের মুখ দিয়া কোনও আজ্ঞা বাহির হইলে, তাহার পুনর্ব্বিচার, আপীল বা ক্ষমা ছিল না। তবে সম্রাট্ নিজে মনে করিলেই প্রত্যাহার করিতে পারিতেন। সম্রাটের মুখের আজ্ঞা উচিত হউক বা অনুচিত হউক, শাস্তি-ভোগকারী প্রকৃতপক্ষে অপরাধী হউক বা নিরপরাধী হউক, আজ্ঞা হইলেই তৎক্ষণাৎ পালিত হইত। সম্রাটের পাশেই

এক বা একাধিক জল্লাদ [শিরশ্ছেদনকারী নরঘাতক] সর্ব্বদা তাহার ভীষণ কুঠার বা খড়্গ বাগাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। সম্রাটের প্রিয় সভাসদেরাও জানিতে পারিতেন না—সম্রাটের সহিত কথা কহিতে কখন্ কি বিষয়ে সম্রাট্ কুপিত হইবেন ও শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিবেন। সকলেই মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। রাজসভাসদের পরিবারবর্গ বাড়ীতে রাঁধিয়া বাড়িয়া যখন গৃহকর্ত্তার প্রত্যাগমন পথ চাহিয়া থাকিত, তখন হঠাৎ তাঁহার ছিন্ন-মস্তক মৃতদেহ আসিয়া উপস্থিত হইত। কখনও তাঁহার দেহাবশেষ আসিবার পূর্ব্বেই রাজকর্ম্মচারীরা সংবাদ আনিত, পরিবারবর্গকে গৃহের বাহির করিয়া মৃত সভাসদের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করিত। গৃহকর্ত্তা সভাসদের এরূপ সত্য বা কল্পিত অপরাধে তাঁহার পরিবার-বর্গকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইতে হইত। কখনও সভাসদের পরিবারবর্গকে, এমন কি, ভিন্ন নগরে স্থিত ভ্রাতা বা পুত্রকে বা অন্য আত্মীয় কুটুম্বকেও শাস্তিভোগ করিতে হইত। মৃত সভাসদের চিরজীবনে সঞ্চিত ধন-রত্ন, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সম্রাট্ হইতেন, তাহার সন্তান ও বিধবারা কিছুই পাইত না। চতুর মনসবদার অমীররা এরূপ বিপদের সময়ের জন্য আপনার কোনও বন্ধুর নামে বাড়ী ও কিছু সম্পত্তি কিনিয়া রাখিত, সেখানে সন্তানরা আশ্রয় পাইত। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অমীররা নগদ

টাকায় বেতন পাইতেন না, এক একখানি জমিদারীর ভার পাইতেন। তাহার আয় হইতে আপনার প্রয়োজনীয় ব্যয় করিতেন, অতএব ঐ জমিদারী বা জায়গীর সম্রাটের সম্পত্তি, যখন ইচ্ছা, পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া বা না দিয়া সম্রাট্ ঐরূপ জায়গীর কাড়িয়া লইতে পারিতেন। রাজভোগে পালিত রাজসভাসদ্-পুত্রেরা এক মুহূর্ত্তে দরিদ্র পথের ভিখারী হইতেন। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে তাঁহার গোর দিবার বা দাহ করিবার ব্যয়ও পাওয়া যাইত না। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা সাহায্য না করিলে পাঁচ-সাতহাজারী মন্‌সবদারের দেহাবশেষও নির্ব্বান্ধব ধনহীন প্রজার মৃতদেহের মত সরকারী দানখাতার ব্যয়ে মাটিতে পুতিয়া দেওয়া হইত বা দাহ করা হইত। মন্‌সবদারেরা প্রায়ই জীবিতাবস্থায় আপনার গোর নির্ম্মাণ করিয়া ঐ গোর ও সৎকারের ব্যয়ের জন্য কিছু টাকা কোনও মসজিদের ধর্ম্মভীরু অধ্যক্ষের কাছে গচ্ছিত রাখিতেন। এরূপ করিলে মৃত্যুর পর সৎকারের ব্যয়ের জন্য লোকের কাছে ভিক্ষা করিতে হইত না। মৃত অমীর বা মন্‌সবদারের যদি কিছু দেনা থাকিত ও বহু ধনরত্ন সঞ্চিত থাকিত, তাহা হইলেও দেহ সম্পূর্ণরূপে প্রাণশূন্য হইবার পূর্ব্বেই সরকারী কর্ম্মচারীরা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করিত। পাওনাদারেরা মৃত অমীরের শবের কাছে আসিয়া গালি দিয়া তাহার পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিত ও আপনার

পাওনা টাকা হারাইয়া, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে গৃহে ফিরিত। সৎকারের জন্য পূর্ব্বব্যবস্থামত কাহারও কাছে কিছু গচ্ছিত থাকিলে সমারোহের সহিত হইত, নতুবা প্রতিবাসী ও বন্ধুবান্ধবেরা চাঁদা করিয়া ব্যয়নির্ব্বাহ করিত। অমীরের পুত্রেরা আবার রাজসেবাতে নিযুক্ত হইয়া স্বয়ং অমীর হইত, কিংবা রাজ-রোষে পড়িলে, অন্য উপায়ে উপার্জ্জন করিয়া আপনার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিত।

গোপাল রাজসভাতে গায়ক পদ পাইয়া অমীর-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে অমীরের সুবিধা-অসুবিধা সকলই ভোগ করিতে হইল। তিনি এই গানের সভাতে সম্রাট্‌কে সন্তুষ্ট করিয়া আরও উচ্চপদ লাভের আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দৈব বাম হয়, তখন সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হয়; রাজাজ্ঞায় তাঁহার শিরশ্ছেদন করা হইল। বৈজু শিষ্যের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য বিস্তর ধ্বাকুতিমিনতি করিলেন, কিন্তু সেকালের সম্রাটের আজ্ঞা ন্যায় হউক বা অন্যায় হউক, যখন সম্রাটের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তখন পালিত হইতই—তাহার অন্যথা অসম্ভব ছিল। প্রজার জীবনের,—সে যতই গুণবান, সম্মানিত বা উচ্চপদস্থ হউক না কেন, কোন মূল্যই ছিল না। গোপালের সঞ্চিত ধনরত্ন রাজকোষে প্রবেশ করিল, তাহার সৎকারের ব্যয় শ্রোতাদের দয়ার দানের উপর নির্ভর করিল।

গোপালের সন্তানের মধ্যে একমাত্র কন্যা মীরা, সে মুখাগ্নি করিয়া সৎকার করিল, পরে অস্থিগুলি যমুনার জলে বিসর্জ্জন দিবার সময়ে রোদন করিতে করিতে মল্লার রাগে গান করিল। প্রবাদ আছে যে, কন্যার আন্তরিক শোকোচ্ছ্বাসে ও গানের প্রভাবে গোপালের শরীরের অস্থিগুলি জুড়িয়া পূর্ণ কঙ্কালরূপ ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে মাংস উৎপন্ন হইল না। সেই অস্থিময় শরীর বা কঙ্কাল হইতে সকলে শব্দ শুনিতে পাইল, গোপাল বলিতেছেন, "মীরা, তুনে বহুৎ কিয়া, লেকিন মেরে কর্ম্ম্‌কা ফল মঁ্যা হি ভোগ্‌ঁগা"।

মীরা এখন পিতৃমাতৃহীনা, বন্ধুবান্ধবহীনা, কপর্দ্দক-হীনা, যুবতী অথচ আশ্রয়হীনা ; তাহার অবস্থা বর্ণনাপেক্ষা কল্পনাসাপেক্ষ। অন্য আত্মীয়-কুটুম্ব কেহ নিকটে নাই, মীরা ও গোপাল মহারাষ্ট্র দেশবাসী, সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ-কুলে তাহাদের জন্ম, ইহা ছাড়া আর কোনও পরিচয় কেহ জানিত না। মীরা স্বয়ং বাল্যাবস্থার কোন সংবাদ দিতে পারিল না। তাহার দেশ কোথায়, সেখানে আত্মীয় কেহ আছে কি না, কিছুই জানিত না। এমন অবস্থায় সম্রাট্‌ই তাহার একমাত্র অভিভাবক, তিনি তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে চিন্তা ও ব্যবস্থা করিতে বাধ্য।

সেকালে দিল্লী, বদাউঁ, বিয়ানা, অযোধ্যা, মুলতান ইত্যাদি স্থানে অনেকগুলি মুসলমান সূফী সাধু পরিবার

স্থায়িভাবে বাস করিতেন। বিদ্যার্জ্জন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, সঙ্গীত-সাধনা, যোগ-সাধনা ইত্যাদিতে তাঁহাদের বংশগত অধিকার ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন সাধু এত ধনরত্ন ও স্থাবর সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, আট দশ পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বংশধরেরা ধনবানদের মত জীবনযাপন করিয়াছেন, এখনও তাঁহাদের মঠগুলি অতি সচ্ছল অবস্থায় আছে। সম্রাটের আজ্ঞাতে মীরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল ও কোনও সঙ্গীতজ্ঞ সাধু-বংশে তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। জনশ্রুতি—এই সাধু-বংশে মহম্মদ ঘওস জন্মগ্রহণ করেন। এই মহম্মদ ঘওসের কন্যার সহিত তানসেনের বিবাহ হয়।

বৈজু শিষ্যের মৃত্যুর পর বিরক্ত হইয়া রাজসভা ত্যাগ করিলেন ও অবশিষ্ট জীবন তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কাটাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ইহার পর তিনি আর কোনও সঙ্গীত-সভাতে যোগ দেন নাই। তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তির কোনও বিশ্বস্ত প্রবাদ নাই। অনেকে অনুমান করেন মাত্র যে, গোপালের মৃত্যুর পর তিনি আর বেশী দিন ধরাধামে ছিলেন না।

তানসেন

প্রায় চার হাজার বৎসর হইল, কুরুক্ষেত্রের চিরস্মরণীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে, গাণ্ডীবধারী কপিধ্বজ ফাল্গুনী যখন স্বয়ং গিরিধারীর পৃষ্ঠপোষকতায় ঘোর বন কাটিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন ও সেই নগরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে ইন্দ্রপ্রস্থই ভারতের রাজধানী বিবেচিত হইতেছে। কালে তাহার অনেকগুলি নামকরণ করা হইয়াছে, একটি রাজধানীর মৃত্যুর পর তাহার দেহাবশেষ কঙ্কালের পাশে অন্য নামে নগর ও রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে। আধুনিক রাজধানী নিউ ডেল্হী।

দিল্লীর লোদীবংশীয় [১৪৫০—১৫২৬ঈ] সম্রাট্গণ আগরাকে আপনাদের রাজধানী করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে নগণ্য আগরা বিস্তৃত নগরে পরিণত হইল। সম্রাট্ অকবরের সময়ে তাহার বিস্তার আরও বাড়িয়া গেল। অকবরের পৌত্র শাহজহাঁ ঐ নগরের নিকটে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নগরের নাম অকবরাবাদ রাখিলেন। আবার কালের গতিতে তাহার পতন হইয়াছে। এখন আগরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ছোট একটি নগর মাত্র।

লোদীবংশীয় সম্রাট্ সিকন্দর লোদী [১৪৮৮—১৫১৬ঈ] যদিও এক হিন্দু স্বর্ণকার-কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি ঘোর হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি যুবরাজ অবস্থা হইতেই হিন্দুদের মন্দির ভগ্ন করা ও তীর্থস্থান লোপ করা আপনার জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছিলেন। তাঁহার আক্রোশ মথুরা ও বৃন্দাবনের প্রতি আরও বেশী ছিল, কেননা, ঐ দুইটি স্থান তাঁহার রাজধানীর অতি নিকটে। বৃন্দাবনে এমন অনেক মন্দির ছিল, যাহার শিখরের প্রদীপ আগরার রাজপ্রাসাদ হইতে দেখা যাইত। সিকন্দরের আজ্ঞায় উত্তর ভারতের সকল বড় ও প্রাচীন মন্দির ভগ্ন করা হইয়াছিল। 'ঐতিহাসিক ফরিশ্‌তা' বলেন, তীর্থস্থান—বিশেষতঃ মথুরা সম্বন্ধে তিনি আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, কোনও তীর্থযাত্রী সেখানে না আসিতে পারে। তীর্থ করিতে যাত্রী আসিলে তাহার শিরশ্ছেদন করা হইত, আবার তীর্থস্থানে —বিশেষতঃ মথুরাতে কোনও যাত্রীর ক্ষৌরকর্ম্ম করিলে নরসুন্দরের হাত কাটিয়া দেওয়া হইত। প্রায় ৩০ বৎসর বা আরও অধিক কাল এইরূপ অত্যাচার থাকায় বৃন্দাবন নগর হইতে মনুষ্যের বাস উঠিয়া গিয়াছিল। যখন ১৫১৫ ঈশাব্দে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, তখন সেখানকার তীর্থস্থানগুলি কোথায়, তাহা দেখাইয়া দিবারও লোক ছিল না। আধুনিক বৃন্দাবন সম্পূর্ণরূপে মহাপ্রভুর ও তাঁহার পার্ষদ ও সেবক দুই ভাই, রূপ ও সনাতনের আবিষ্কৃত।

বহুকাল জনমানবহীন মরুভূমির রূপ ধারণ করিবার পর আধুনিক বৃন্দাবনের প্রথম বড় মন্দির—মদনমোহনের মন্দির—সনাতনের চেষ্টায় ১৫৩৩ ঈশাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে সম্রাট্ অকবরের সময়ে নানা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া আবার তীর্থস্থান রূপ ধারণ করিয়াছিল। অওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অনেক বড় বড় মন্দির ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরধর্ম্মসম্মানকারী বৃটিশ রাজত্বকালে আবার বৃন্দাবন মন্দির-বহুল তীর্থস্থান রূপ ধারণ করিয়াছে। বৃন্দাবনের চতুর্দ্দিকে ৮৪ টি বনের সমষ্টিকে ব্রজমণ্ডল বলে। বৃন্দাবন নগর জনশূন্য হইলেও বৃন্দাবনের বনে বা ব্রজমণ্ডলে নানাস্থানে সাধু-সন্ন্যাসীরা প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিদের মত তপোবন বা আশ্রম স্থাপন করিয়া বাস করিতেন। তবে, তাঁহাদের তপোবনগুলি পর্ণকুটীর মাত্র ছিল, সেখানে গগনচুম্বী মন্দির ছিল না, অতএব মুসলমান সম্রাট্দের হিংসা উদ্রেক করিবার মত কিছুই ছিল না। এই বৃন্দাবনের মধ্যে একস্থানে হরিদাস নামক এক মহাপুরুষ বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, বিদ্বান, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, যোগী ও সাধক বা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ছিলেন। সমাজে তিনি ললিতা সখীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে কিছুই জানা নাই। কেহ তাঁহাকে মুলতানবাসী সারস্বত ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব, কেহ সনাঢ্য কুলোদ্ভব লিখিয়াছেন। তিনি

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ান্তর্গত “টট্টীওয়ালী” বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার রচিত সিদ্ধান্তের ১৯ টি পদ ও কেলিমাল (১১০ পদ) নামক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। আরও অনেক গ্রন্থ ছিল, এখন লোপ পাইয়াছে। তাঁহার কাছে অনেকগুলি বিদ্যার্থী শিষ্য থাকিত, অনেকগুলি রাজা তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে তিনি এই শিষ্যমণ্ডলীকে প্রতিপালন করিতেন, ও যে যে বিদ্যা শিক্ষা করিতে চাহিত, তাহাকে তাহাই শিক্ষা দিতেন। তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। প্রবাদ আছে যে, তিনি যোগবলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সংবাদ বলিতে পারিতেন, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি সকলের, এমন কি, পশু-পক্ষীর মনের কথা জানিতে পারিতেন। ইচ্ছা করিলেই যোগবলে আপনার স্থূল শরীর লইয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারিতেন ও ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর জীবিত ছিলেন।

গোপাচলে বা গোয়ালিয়রে মুকুন্দ পাণ্ডে নামক সাধারণ অবস্থার এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান হইয়া শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি বড় দুঃখিত থাকিতেন। তিনি সন্তানের দীর্ঘজীবন লাভ কামনায় শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিছু কাল একনিষ্ঠ ভাবে আরাধনার পর, একদিন আদেশ পাইলেন যে, এইবার যে পুত্র সন্তান হইবে, তাহাকে শ্রীবৃন্দাবনে সাধু-

শ্রেষ্ঠ হরিদাস স্বামীর চরণে রাখিয়া দিলে দীর্ঘজীবী হইবে। মুকুন্দ এই আদেশ পাইয়া পুত্রের জন্মের আশা-পথ দেখিতে লাগিলেন। যথাসময়ে একটি পুত্র প্রসব করিয়া তাঁহার পত্নী ধরাধাম ত্যাগ করিলেন। মুকুন্দ সদ্যঃপ্রসূত শিশু ক্রোড়ে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন, কিন্তু বৃন্দাবন নগর তখন জনমানবহীন, প্রকৃত পশু থাকিবার বন হইয়া রহিয়াছে। বৃন্দাবন নগরের নিকট ৮৪টি বনের সমষ্টিই প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবন বা ব্রজধাম। মুকুন্দ ভগবৎ-আদেশে কেবল মাত্র হরিদাস স্বামীর নাম পাইয়াছিলেন, আর কোনও সন্ধান জানিতেন না। তিনি নানা স্থানে খুঁজিয়া সাধু হরিদাস স্বামীর আশ্রম বা তপোবন আবিষ্কার করিলেন। হরিদাস সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি সন্ন্যাসী, এই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে পালন করিবার জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, তাহা আমার নাই; অতএব তুমি উহাকে লইয়া যাও, উহার উপনয়নের পর আমার কাছে আনিও। এখন আমি পুত্র স্বীকার করিয়া তোমাকেই পালন করিবার ভার দিলাম। মুকুন্দ শিশুকে লইয়া ঘরে আসিলেন ও তাহাকে হরিদাস স্বামীর পুত্ররূপে পালন করিতে লাগিলেন। শিশু পাঁচ বৎসরের হইলে তাহাকে আবার হরিদাস স্বামীর কাছে আনিলেন ও তাঁহার আশ্রমের কাছে উপদেশ শুনিবার ও সৎসঙ্গ লাভের প্রলোভনে, এক পর্ণ-কুটীর বাঁধিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়েই বালকের প্রয়োজনীয়

প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হইল। এইরূপে দুই বৎসর সাধু-সঙ্গে উপকৃত হইবার পর শিশুর উপনয়ন দিয়া, হরিদাস বাবাজীর শ্রীচরণে তাহাকে বাস করিতে অভ্যস্ত করিয়া মুকুন্দ গোপাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার অল্পকাল পরে, মুকুন্দ ধরাধাম ত্যাগ করিলেন। এইরূপে, মুকুন্দের শেষ বয়সের ঔরস পুত্র, হরিদাস স্বামীর পালক পুত্র ও শিষ্যরূপে গুরুর আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। বালকের পিতা কি নামকরণ করিয়াছিলেন, জানা নাই, কিন্তু স্বামীজী অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া তাহার নাম রামতনু (অর্থাৎ ভগবদ্দত্ত শরীর) রাখিলেন।

রামতনুর যত বয়স বাড়িতে লাগিল, হরিদাস স্বামী দেখিলেন, তাহার বুদ্ধি তাহার বয়সের অনুপাতে অতি প্রখর, স্মরণ শক্তি অমানুষিক, আবার সঙ্গীত বিদ্যাতে অনুরাগ আন্তরিক ও অত্যন্ত বেশী। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই প্রতিভাবান শিশু পূর্ব্বজন্মের সংস্কার-বলে অতি উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ হইবে। রামতনু গুরুর আশ্রমের সকল প্রকার সেবার কাজ মনোযোগের সহিত করিতেন, অথচ সেই সময়ে গুরুদেবকে কোনও বিশেষ প্রকার গান করিতে শুনিলে, আপনার কাজ না ছাড়িয়াও গানের সুর ইত্যাদি আয়ত্ত করিতেন। তিনি আশ্রমের কাজগুলি, যথা—গোসেবা, কাষ্ঠচ্ছেদন ও বহন, জল উত্তোলন ও বহন, ফলমূল আহরণ ইত্যাদি প্রফুল্ল মনে অতি অল্প সময়ে শেষ করিতেন। আবার

গুরুদেব কোনও স্থানে গমন করিলে দেখিতে পাইতেন যে, অক্লান্তকর্ম্মা রামতনু তাঁহার সেবার জন্য,সঙ্গে চলিয়াছে, তাহাকে বলিতে বা ডাকিতে হইত না। প্রবাদ আছে যে, প্রাচীন কালে এরূপ দৃঢ়মনে ভক্তিভরে গুরু সেবা করিয়া লোকে কেবল গুরুর আজ্ঞায় বা আন্তরিক আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া জ্ঞানশালী হইয়াছে। রামতনুর সহপাঠীরা প্রায়ই বলাবলি করিত যে, গুরু-কৃপায় রামতনু তাহাদের অপেক্ষা বেশী জ্ঞানবান ও কৃতী হইবে, সন্দেহ নাই।

একদিন হরিদাস স্বামী এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ভজন করিতেছিলেন। ক্রমে নিজেই নিজের গানে মোহিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে তিনি শ্রীভগবানের যুগল মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই কথা প্রকাশ হইলে, সেই স্থানে তাঁহার ভক্তেরা মিলিয়া যুগলমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া একটি কুটীর বাঁধিয়া তাঁহার বাস করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, মোহিনীদাস নামক তাঁহার এক ভক্ত একাই যুগলমূর্ত্তি স্থাপন ও কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি শিষ্যগণকে লইয়া ব্রজমণ্ডলের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু মূর্ত্তিস্থাপনের পর স্থায়ী হইলেন।

অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষা করিবার পর রামতনু দ্বাদশ বর্ষকাল কেবল সঙ্গীত শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়া গুরুর প্রিয় ও কৃতী হইলেন। এক দিবস রামতনু গুরুদেবের নিকট হইতে কিছু দূরে, আশ্রমের কোনও কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে

গুরু হরিদাস স্বামী এক জলাশয়-তীরে বসিয়া একটি রাগিণী আলাপ করিতেছিলেন। স্বামীজীর স্বর যখন পর্দ্দায় পর্দ্দায় উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উঠিল, তখন রামতনু দূর হইতেই তাহা শুনিয়া আয়ত্ত করিয়া লইলেন। যখন রামতনু নিকটে আসিলেন, তখন সর্ব্বজ্ঞ গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, "রামতনু, তুমি আজ একটি দুর্ম্মূল্য দ্রব্য চুরি করিয়া আয়ত্ত করিয়াছ, কিন্তু বৎস, স্মরণ রাখিবে, ঐ রাগ যথা-তথা বসিয়া আলাপ করিও না। কোনও জলাশয় তীরে—বড় পুষ্করিণী বা নদী-তীরে—বসিয়া গাহিও, ইহার অন্যথা করিলে বিপদে পড়িবে, সুরের উত্তাপে শরীর দগ্ধ হইয়া যাইবে ও প্রাণ হারাইবে।"

ক্রমে, যুবক হইলেও, রামতনুর যশঃ দেশ-দেশান্তরে সঙ্গীত-সমাজে ছাড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে হরিদাস স্বামীর সঙ্গীত বিদ্যায় শিষ্যদের মধ্যে মদনরায় ও রামদাস নামক দুইটি যুবক কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। স্বামীজী আপনার প্রিয় শিষ্যদের সাংসারিক ও আর্থিক উন্নতিরও চিন্তা করিতেন। তিনি যথাসময়ে মদনরায় ও রামদাসকে দিল্লী পাঠাইয়াছিলেন। এখন রামতনুকে আপনার ভক্ত শিষ্য রীবাঁর রাজা রামসিংহের [বা রামচন্দ্রের] কাছে পাঠাইলেন।

দিল্লীর রাজ-দরবারে ১৫৪০ ঈশাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দু গায়কদের কথা মুসলমান-রচিত ইতিহাসে পাই নাই। সুরবংশীয় আফগান সম্রাট্দের সভাতে [১৫৪০-১৫৫৫ঈ], তাহার পর অকবরের শিক্ষক ও মন্ত্রী বেরম খাঁ খান-খানার

সভাতে [১৫৫৬-১৫৬০ঈ] ও তাহার পর অকবরের সভাতে [১৫৬১ হইতে] পৃথ্বীরাজ রাসোর কবি চন্দবরদাইর বংশজ ভাটকুলোদ্ভব বাবা রামদাস গোয়ালিয়রী নামক এক প্রসিদ্ধ গায়কের উল্লেখ নানা ঐতিহাসিক করিয়াছেন। এই রামদাস বা বাবা রামদাসের পুত্র সূর্য্যদাস [সূরজ দাস, সূরদাস]-ও একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত গায়ক ও হিন্দিভাষার উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। কবিতার সমালোচকেরা তাঁহাকে কাব্য-জগতের সূর্য্যস্বরূপ, তুলসীদাসকে চন্দ্র-স্বরূপ ও কেশবদাসকে তারকা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সূর সূর, তুলসী শশি, উড়গণ কেশবদাস।
অবকে কবি খদ্যোৎ সম জহঁ তহঁ করেঁ প্রকাশ॥

অবুলফজল তাঁহার রচিত আইন-অকবরীতে গায়কদের তালিকাতে এই পিতা-পুত্রের নাম লিখিয়াছেন, কিন্তু সেকালে গুরুর নামোল্লেখ করা নিয়ম থাকা সত্ত্বেও হরিদাস-স্বামীর নাম কোনও ঐতিহাসিক লেখেন নাই, সেই জন্য এ সম্বন্ধে নিশ্চয়রূপে মত স্থাপন করা অসম্ভব।

দিল্লীতে তখন ঘোর অরাজকতা ছড়াইয়াছিল। ১৫৪০ ঈশাব্দে বেহারের ফরীদ খাঁ নামক সামান্য অফগান জমীদার পুত্র ও সেনানী দিল্লীর মোগলবংশীয় সম্রাট্ হুমায়ুঁকে তাড়াইয়া স্বয়ং শেরশাহ সূর নাম ধারণ করিয়া সম্রাট্ হইয়াছিলেন। হুমায়ুঁ ভারত ছাড়িয়া পশ্চিম দেশে, ইরাণে,

পলাইলেন। পরে ইরাণপতি শাহ তহ্মাস্পের সাহায্যে কান্ধার ও কাবুল জয় করিয়া অফগানিস্থানে রাজ্য করিতে লাগিলেন। এঁদিকে শেরশাহের ও তাঁহার পুত্র সলীম-শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীতে আবার অরাজকতা দেখা দিল। সু-অবসর বুঝিয়া ১৫৫৫ ঈশাব্দে হুমায়ুঁ আবার দিল্লী আক্রমণ করিয়া জয় করিলেন, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার তের বৎসর [১৩ বৎসর তিন মাস সাত দিন]-বয়স্ক, অতি সৌভাগ্যবলে বলীয়ান্ পুত্র অকবর সম্রাট্ হইলেন। সে সময়ে দেশে কয়েক বৎসরের অনাবৃষ্টির ফলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, অন্নাভাবে মানুষে মৃত আত্মীয়ের মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবিত ছিল। দেশে অন্ন ছিল না, সরকারী খাতাতে বাজার-দর লেখা হইত, মকাই আড়াই টাকা সের, কিন্তু কোনও বাজারে একটি মকাইর দানা ছিল না। রাজাহীন দেশে চুরি-ডাকাতির অভাব ছিল না, সোনারূপা অপেক্ষা গায়ের মাংস বড় শত্রু ছিল, কেননা সোনা দিয়া আহারীয় পাওয়া যাইত না, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট একটি মানুষ মারিতে পারিলে তাহার মাংস খাইয়া কয়েকটি লোকের পেট ভরিত। অতএব লোকে সোনা-রূপার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া জীবিত বা মৃত মনুষ্য বা পশু-পক্ষীর দেহ খুঁজিত। পথে ঘাটে মৃত কুকুর বিড়াল ইত্যাদি কোনও পশুর শব পড়িয়া থাকিলে তাহার মাংস লাভ করিবার জন্য লোকে মারামারি করিয়া জীবন দান করিতে

কুণ্ঠিত হইত না। ইতিহাসে এরূপ দুর্ভিক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই খাদ্যাভাবের সময়ে রাজ্যের জন্য নানা সম্প্রদায়ে ঘোর যুদ্ধ হইতেছিল। শেরশাহের বংশের অফগানেরা যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের নানা স্থানে আপনাদিগকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। একে অনাবৃষ্টির জন্য খাদ্যাভাব, তাহার উপর সমস্ত দেশব্যাপী যুদ্ধবিপ্লব; সে সময়কার অবস্থা কল্পনাসাপেক্ষ। সেকালে দূর দেশের সহিত বাণিজ্য ছিল না, দূর দেশ হইতে শস্য সংগ্রহ যতটুকু সম্ভব, তাহাও অরাজকতার জন্য অসম্ভব হইয়াছিল। দেশে নদীতীরে বা কূপজল-সাহায্যে খাদ্য উৎপন্ন করা সম্ভব ছিল বটে, কিন্তু কেহ কিছু উৎপন্ন করিলে বলবানেরা উৎপন্নকারী কৃষককে প্রাণে মারিয়া কাড়িয়া লইত, অতএব কেহ তাহাও করিত না।

অকবর যখন পঞ্জাবে অফগানদের সহিত যুদ্ধ করিতে-ছিলেন, তখন পিতার মৃত্যু [২৪ জানুয়ারি, ১৫৫৬]-সংবাদ পাইলেন। কলানূরের বিজন বনে স্কন্ধাবারে মন্ত্রী বেরম তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন [২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৫৫৬]। সেই সময়ে শেরশাহ বংশের হিন্দু বৈশ্যকুলোদ্ভব মন্ত্রী হেমচন্দ্র বা হেমু দিল্লী ও আগরা জয় করিয়া বিক্রমাদিত্য উপাধি সহ সিংহাসনারোহণ করিলেন। সৌভাগ্যবান বালক অকবর অল্প সময়ের মধ্যে আবার দিল্লী ও আগরা জয় করিয়া, হেমুকে নিহত করিয়া, পুনর্ব্বার রাজ্য অধিকার করিলেন।

দিল্লী ও আগরা জয় করিয়াই দূরদর্শী বালক সম্রাট্ দূর দেশ হইতে বহুব্যয়ে শস্য আনিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার প্রাণরক্ষা করিলেন। এইরূপে রাজ্যলাভ করিয়াই প্রজার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার প্রকৃত অভিষেক-ক্রিয়া নির্জ্জন বনমধ্যে হইয়াছিল বলিয়া, দিল্লী রাজধানীতে অভিষেকের দরবার বা বিরাট্ উৎসবের ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে দেশ-দেশান্তরের রাজারা নিমন্ত্রিত হইলেন। রীবাঁর রাজা রামসিংহও রামতনুকে সঙ্গে করিয়া সেই উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন।

রামসিংহ স্বয়ং বিদ্বান, সঙ্গীতজ্ঞ ও ভক্ত ছিলেন। তিনি রামতনুকে অপনার গুরুর মতই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। যখন দিল্লীতে দেশ-দেশান্তরের রাজারা একত্র হইলেন; তখন ঐ রাজাদের সঙ্গী সঙ্গীতজ্ঞদের গানও হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, রামতনুর গানের সময়ে অকবর এমন মোহিত হইয়াছিলেন যে, আপনার সিংহাসন ছাড়িয়া রামতনুর কাছে আসিয়া বসিয়া গান শুনিয়াছিলেন। সে সময়ে অকবরের বাল্যাবস্থার শিক্ষক ও প্রধান মন্ত্রী, অকবরের পিতা হুমায়ুঁর চিরজীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী, মর্ম্মী বন্ধু তুর্কমান-বংশীয় বেরম খাঁ খান-খানা রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। বেরম একজন সঙ্গীতরসজ্ঞ ভক্ত শ্রোতা ছিলেন, তিনি ভক্তি বিষয়ের গান শুনিতে ভালবাসিতেন। প্রায়ই ভক্তির গান শুনিয়া

তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। সে সময়কার দিল্লীর গায়কগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত-কবি সূরদাসের পিতা—বাবা রামদাসের গান শুনিতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিত ও সে সময়কার রাজকোষের অবস্থা ভাল না হইলেও কয়েকবার তাঁহাকে এক একটি গানের জন্য লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। যুবক রামতনুকে নিকটে পাইয়া তিনিও বৃদ্ধ রামদাসের কথা ভুলিয়া যাইতেন। যদিও বাবা রামদাস যুবক রামতনু অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, তথাপি ঐতিহাসিক অব্‌দুল কাদির বদাউনী বাবা রামদাসকে "দ্বিতীয় তানসেন" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সম্রাট্ রামসিংহের কাছে রামতনুকে চাহিলেন, কিন্তু রামসিংহ উত্তর করিলেন, "রামতনু আমার গুরু হরিদাস স্বামীর শিষ্য, তাঁহার আজ্ঞা না পাইলে আমি রামতনুকে দিতে অক্ষম।" ইহার পর রামসিংহ রামতনুকে লইয়া রীবাঁ ফিরিয়া গেলেন।

সম্রাট্ অকবর রামতনুর গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। ভাবিলেন, তাঁহার গুরু হরিদাস স্বামী তাঁহা অপেক্ষা শক্তিশালী গায়ক হইবেন, অতএব তাঁহার গান শুনিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। গুপ্ত সংবাদ-দাতারা সম্রাট্‌কে জানাইল যে, হরিদাস স্বামী ব্রজমণ্ডলে বনমধ্যে আপনার কুটীরে বাস করেন। তিনি একজন ত্যাগী সিদ্ধপুরুষ, তিনি অর্থের বা কোনও প্রকার সম্মানের

প্রলোভনে রাজদরবারে আসিবার পাত্র নহেন, অতএব তাঁহাকে আসিতে অনুরোধ না করিয়া, যে উপায়ে হউক, একবার ছদ্মবেশে তাঁহার আশ্রমে গিয়া গান শুনিবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজা রামসিংহের রীবাঁ ফিরিয়া আসিবার অল্পকাল পরে, হরিদাস স্বামী একদিন হঠাৎ রীবাঁতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দরবারের সমস্ত সংবাদ দিলেন। ইহার কয়েক দিবস পরে, স্বামীজী রামতনুকে সঙ্গে লইয়া ব্রজধামে আপনার আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। আশ্রমে পৌঁছিয়া আবার রামতনুর শিক্ষায় ও অভ্যাসে পূর্ব্ববৎ মনোযোগী হইলেন।

একদিন স্বামীজী রামতনুকে বলিলেন, "বৎস, আমার বোধ হইতেছে, সম্রাট্ অকবর মাত্র দুইজন সেবক সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে আমার আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, আর দুই দিন পরে এখানে আসিবেন। সাধুর কুটীরে অতিথির সেবার ভার তোমার প্রতি রহিল, প্রস্তুত থাকিবে।" তৃতীয় দিবসে হরিদাস স্বামী দুই প্রহরের ভোগের পর ভজনানন্দে মত্ত ছিলেন, রামতনুও মধ্যে মধ্যে আলাপে যোগ দিতেছিলেন; ব্রজবাসী প্রতিবাসীরা চিত্রপুত্তলির ন্যায় আশ্রমের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল, হঠাৎ রামতনু দেখিলেন, শ্রোতার জনতা মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবক দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছেন। তাঁহার বেশ সাধারণ ভদ্রবংশীয় মোগল যুবকের মত



হরিদাস স্বামী দুইপ্রহরের ভোগের পর ভজনানন্দে মত্ত ছিলেন, রামতনুও মধ্যে মধ্যে আলাপে যোগ দিতেছিলেন।......জনতার মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছেন।......৩৪ পৃঃ

হইলেও অবয়বে প্রাধান্যের চিহ্ন প্রকাশিত, যদিও তাঁহার দেহের বর্ণ সে সময়কার অন্য মোগলদের মত উজ্জ্বল গৌর নহে ও শরীরও দীর্ঘায়তন নহে—মাঝারি মাত্র, তথাপি তাঁহার প্রতিকৃতিতে এমন এক বস্তু ছিল যে, যতই ছদ্মবেশে থাকুন না কেন, যে দেখিত, সে সম্ভ্রম ও সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিত না। সাধারণ গ্রাম্য বা বনবাসী শ্রোতাদের মধ্যে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন বটে, ও তাঁহার শরীরে অস্ত্রশস্ত্র ভয়-উৎপাদক কিছুই ছিল না, তথাপি অন্য শ্রোতারা সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, নিকটে আসিতে সাহসী হইতেছিল না। স্বামীজী ও রামতনু তাঁহার আগমন-সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, রামতনু তাঁহাকে অভিষেকের উৎসবে নিকটে দেখিয়াছিলেন, অতএব চিনিতে পারিলেন। কিন্তু সে সময়ে চিনিয়াও প্রকাশ্যে অভ্যর্থনা করিলেন না। এই সময়ে হরিদাস স্বামী "লঙ্কদহন সারঙ্গ" রাগ আলাপ করিতেছিলেন, এই রাগের ঠাট "স র মা প ধ না"। ইহার ফলে চতুর্দ্দিকে বনমধ্যে অগ্নিশিখার আবির্ভাব হইয়াছিল। দর্শকেরা ছুটাছুটি করিয়া পলাইতে লাগিল কিন্তু চারিদিকেই অগ্নির লেলিহান শিখা দেখিয়া ভয়ে পথহারা হইয়া পড়িল। এমন সময়ে স্বামীর ইঙ্গিতে রামতনু রাগ পরিবর্ত্তন করিয়া "জলধর সারঙ্গ" আলাপ আরম্ভ করিলেন, তাহার ঠাট "স র মা না"। উহার ফলে মুষলধারে বারিপাত

হইতে লাগিল। তখন যে দর্শকগণ (ও দর্শকের মধ্যে সম্রাট্) পূর্ব্বে অগ্নির উত্তাপে পলাইয়াছিলেন, তাঁহারাই বৃষ্টি হইতে আশ্রয় লাভ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বামীজীর ইঙ্গিত পাইয়া রামতনু সম্মানিত অতিথিকে কুটীরে প্রবেশ করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন, পরে ঋষি-আশ্রমের নিয়মানুসারে ফলমূল ও দুগ্ধ দিয়া অতিথির সেবা করিলেন। সম্রাট্ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ছদ্মবেশ বৃথা হইয়াছে, স্বামী ও তাঁহার শিষ্য তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন।

সন্ধ্যারতির পর যুবক সম্রাট্ আবার স্বামীর ভজন শুনিতে লাগিলেন। গানের প্রভাবে বাহ্য জগৎ তাঁহার দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইল। অল্পকাল পরে তিনি আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার কি সাধ্য যে, উহার মেরামত করাইয়া দিই।" সম্রাটের এক ছদ্মবেশী সেবক এই প্রলাপ শুনিয়া, অর্থ বুঝিতে না পারিয়া চিন্তিত হইল ও সম্রাট্কে ঐরূপ উক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সম্রাট্ বলিলেন, "আমি ভজন শুনিতে শুনিতে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে, স্বামীজী নদীতীরে বসিয়া রাগ আলাপ করিতেছেন ও বালুকাপূর্ণ নদীতট যতদূর দৃষ্টি যায় মহামূল্য নানা প্রকার মণি-মুক্তাদ্বারা অলঙ্কৃত রহিয়াছে, কেবলমাত্র এক স্থানে এক খানি প্রস্তর আসন ভাঙ্গা অবস্থায় পড়িয়া আছে। স্বামীজী যেন আমাকে প্রস্তরাসন দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি

উহার মেরামত করাইয়া দিতে পার কি না?' আমি চতুর্দ্দিকের মণিরত্ন-জড়িত বেলা-ভূমি দেখিয়া ভয় পাইলাম ও বলিলাম, আমার কি সাধ্য যে উহার মেরামত করাই।" অকবর বুঝিতে পারিলেন যে, যদিও হরিদাস স্বামী সামান্য পর্ণ কুটীরে দরিদ্রের মত বাস করেন, তথাপি তাঁহাকে দিল্লীর রাজ-সিংহাসনের ধন-ঐশ্বর্য্য দ্বারা প্রলুব্ধ বা বশীভূত করিবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র।

ভজন শেষ হইলে সম্রাটের সহিত স্বামীজীর নানা বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। কথা-প্রসঙ্গে সম্রাট্ জানিতে চাহিলেন যে, হিন্দুরা যে পূর্ব্ব জন্মের কথা বলিয়া থাকে, তাহা সত্য কি না? স্বামীজী উত্তর করিলেন, পূর্ব্বজন্মের কথা বা জন্মান্তর-বাদ নিশ্চয়ই সত্য কথা। কোন কোন লোকের পূর্ব্ব জন্মের অনেক কথা মনে থাকে, এরূপ লোককে জাতিস্মর বলে। তবে, সাধারণ লোকের সে কথা মনে থাকে না, সেই জন্য লোকে অবিশ্বাস বা সন্দেহ করে। শৈশব সম্বন্ধে সকলের স্মৃতিশক্তি একরূপ নহে। কেহ বা শৈশবের অনেক কথা বলিতে পারে, কেহ দুই চারিটা কথা বলিতে পারে, কেহ মোটে পারে না। যে মোটে পার না, তাহার কি বিশ্বাস করা উচিত যে, শৈশব অবস্থা কোন কালে ছিল না। জগতে কোনও দ্রব্যের নাশ হয় না, রূপান্তর হয় মাত্র, সেইরূপে আত্মারও নাশ হয় না। দেহ জীর্ণ হয়, এক দেহ জীর্ণ হইলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া আত্মা অন্য দেহ আশ্রয় করে মাত্র।

মায়া-মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের শরীরে মধ্যে মধ্যে ভগবানের আবেশ হইত, সে সময়ে,অর্থাৎ আবিষ্ট অবস্থায় তিনি যাহা উপদেশ দিতেন, তাহা তাঁহার নিজের উপদেশ নহে, স্বয়ং ভগবানের বাক্য। তিনি ঐরূপ অবস্থায় অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকে গীতা বা ভগবদ্গীতা বলে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ আত্মা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০॥ অধ্যায়২

এই আত্মা কখনও জন্মে না বা মরে না অথবা পুনঃ জন্মিয়া থাকে—এরূপ নহে; কারণ, ইহা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ, শরীর হত হইলেও হত হয় না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২॥ অধ্যায় ২

মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহ সকল ত্যাগ করিয়া অপর নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়॥ এই সময়ে সম্রাট্ স্বীকার করিলেন, তাঁহার অতি শৈশব অবস্থার অনেক কথা বেশ মনে আছে। তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "তুর্কদের মধ্যে অনেক বংশে, বিশেষতঃ তৈমুর বংশে নিয়ম আছে যে, বালক যখন দাঁড়াইতে আরম্ভ করে কিন্তু ভাল করিয়া দাঁড়াইতে পারে না, সেই সময়ে একদিন আত্মীয়

কুটুম্বদের সভা করা হয়। বালককে মধ্যে দাঁড় করাইয়া তাহার পিতা অথবা পিতৃস্থানীয় কোন আত্মীয় আপনার মাথার পাগড়ী খুলিয়া সেই পাগড়ী দিয়া বালককে আঘাত করে, বালক পড়িয়া গেলে বা বসিয়া পড়িলে শুভ বিবেচনা করিয়া নানা রূপে আনন্দ প্রকাশ করে, বন্ধু-বান্ধবদের ভোজ দেয়, ইত্যাদি। অকবরের যখন এই উৎসবের মত বয়স হইল, তখন তাঁহার রাজ্যহীন গৃহহীন পিতা হুমায়ুঁ রাজ্য হারাইয়া ইরাণে আশ্রয় খুঁজিতে গিয়াছিলেন, মাতা হমীদা বানু তাঁহার সহিত ছিলেন। শিশু অকবর কয়েকটি সেবক-সেবিকা সহিত তখন আপনার খুড়া ও পিতার পরম শত্রু মির্জা অসকরীর কাছে বন্দী ছিলেন। অসকরীই তখন পিতৃস্থানীয়, তিনি সেবকদের অনুরোধে এই উৎসব করিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি কিরূপে পাগড়ী মারিয়াছিলেন ও কিরূপে অকবর পড়িয়া গিয়াছিলেন, সবিস্তর বর্ণনা করিলেন। স্বামীজী বলিলেন, যোগীরা যোগবলে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন যে, নিজের ও পরের—যে কোন ও ব্যক্তির বা জীব-জন্তুর—পূর্ব্ব জন্মের কথা জানিতে পারেন। তবে সকলের কাছে সকল কথা প্রকাশ করা সম্বন্ধে শাস্ত্রের নিষেধ আছে। এই কথা শুনিয়া অকবর আপনার পূর্ব্বজন্মের সংবাদ জানিতে আগ্রহ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী কতকক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন, আমি ভাবিতেছিলাম তোমাকে পূর্ব্বজন্মের কোন কথা বলা উচিত কি না। চিন্তা করিয়া দেখিলাম,

তাহাতে লাভ না থাকিলেও ক্ষতি কিছুই নাই, অতএব বলিতেছি, শুন। "তুমি পূর্ব্বজন্মে প্রয়াগ-তীর্থবাসী এক যোগী তপস্বী ছিলে, বহুকাল তপস্যা করিবার পর, তুমি ও তোমার এক সহচর বন্ধু রাজ্যলাভ কামনা করিয়া উভয়ে এক সঙ্গে সরস্বতী কুণ্ডে দেহত্যাগ করিয়াছিলে। তোমার ও তোমার বন্ধুর কর্ম্মফল এক প্রকার নহে, তুমি আপনার কর্ম্মফলের বলে রাজ্যের অধিকারী হইয়াছ, কিন্তু তোমার বন্ধুর সেরূপ বল নাই, অতএব সে রাজা হয় নাই। কর্ম্মফলের প্রয়োজন না হইলে সকলেই রাজা হইতে পারিত। তোমার বন্ধু তোমার সহচররূপে কতক রাজসুখ ভোগ করিবে, কিন্তু রাজক্ষমতা তুমি তাহাকে দিলেও সে ভোগ করিতে পারিবে না। স্বামীজী আরও বলিলেন, তুমি এ জীবনে সৌভাগ্যবান হইবে, অদূর ভবিষ্যতে তোমার সাম্রাজ্য বহু-বিস্তৃত হইবে, তোমার প্রতাপে তোমার শত্রুরা অত্যন্ত ভীত হইবে, কেবল নাম শুনিয়াই তাহাদের আতঙ্ক উপস্থিত হইবে, তোমা অপেক্ষা অনেক বলবান্ শত্রুও তোমার সম্মুখীন হইতে সাহস করিবে না।" অকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পূর্ব্ব জন্মের সঙ্গী কে ও কোথায়?" স্বামীজী উত্তর করিলেন, "তাহার জন্ম তোমার জন্মের পূর্ব্বেই হইয়াছে, তাহার দরিদ্রতা ও অন্নকষ্ট-ভোগ এখনও কাটে নাই, শীঘ্রই কাটিবে, তখন তোমার সহিত মিলন হইবে ও তোমার মন্ত্রণাদাতা বিশ্বাস-পাত্র হইবে।" অকবর তাহার নাম জিজ্ঞাসা করায়

স্বামীজী বলিলেন, "তাহার নাম আমি জানি না, বলিতে পারি না। এইমাত্র বলিতে পারি যে, পূর্ব্ব জন্মে তাহার যে জাতি ও বর্ণ ছিল, এবারও তাহাই আছে—পরিবর্ত্তন হয় নাই। তোমার সহিত তাহার মিলন হইলেই তোমরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এত আকৃষ্ট হইবে যে, তুমি আপনি মনে মনে বুঝিতে পারিবে, তোমাকে বুঝাইয়া বা বলিয়া দিতে হইবে না। তবে কত দিনে দেখা হইবে, ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় অতি শীঘ্রই দেখা হইবে।"

অকবর স্বামীজীকে বলিলেন, "আমি সম্রাট্, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, আমার আগমন বিফল হওয়া উচিত নহে, আমি আপনাকে কিছু উপহার দিতে চাই, আপনি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করুন।" স্বামীজী বলিলেন, "আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমি আর কি প্রার্থনা করিব, আমার কিছুই চাই না।" অকবর বারবার পীড়ন করাতে বলিলেন, "যদি একান্ত কিছু দিতে চাও, তবে কেশীতীরে খেচর পক্ষীদের জন্য কিছু অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া দাও, তাহা হইলেই আমার দান গ্রহণ করা হইবে।" অকবর এই অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। স্বামীজী ইহা ছাড়া আর কিছু স্বীকাব করেন নাই।

পরদিবস সম্রাট্ আপনার ছদ্মবেশী সেবকদের লইয়া দিল্লী যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। যাত্রা করিবার সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামতনুর শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে কি

না” । অতঃপর তিনি স্বামীজীর কাছে রামতনুকে চাহিলেন। স্বামীজী বলিলেন, রামতনুর শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এ বিদ্যায় কৃতী হইলেও চিরকাল অভ্যাস করিতে হয়, অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা জীবনে কখনও শেষ হয় না। রামতনুকে দিবার সম্বন্ধে বলিলেন, রামতনু রীবাঁর রাজা রামসিংহের গুরু, তিনি যদি দেন, তবে লইয়া যাও, আমার কোন আপত্তি নাই

অকবর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দুই জন উচ্চ শ্রেণীর গায়ক রামসিংহের কাছে পাঠাইয়া দিলেন ও তাহাদের স্থানে রামতনুকে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। রামসিংহ আর কোনও আপত্তি করিতে পারিলেন না, অতএব রামতনু আগরা ও দিল্লীতে আসিয়া রাজসভা অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। অকবর গুণবান্ ব্যক্তিদের আপনার সভাতে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ও অল্পকাল মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জগৎপ্রসিদ্ধ গুণীদের একত্র করিলেন, ইঁহারাই ইতিহাসে ‘নবরত্নের সভা’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। দিন দিন রামতনুর খ্যাতি ও যশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সম্রাট্ তাঁহাকে তানসেন উপাধি দ্বারা ভূষিত করিলেন। প্রথমে সাধারণ গায়ক ছিলেন, পরে অমীরদের শ্রেণীতে গণ্য হইতেন।

অবুলফজল রচিত আইন-অকবরীতে সম্রাট্ অকবরের সভাতে যে সকল গুণী, বিদ্বান, কবি, গায়ক, বাদক, সাধক,

তপস্বী ইত্যাদি রত্নগণ ছিলেন, তাঁহাদের তালিকা আছে। তাহাতে গায়ক সম্প্রদায়ে তানসেনের নাম সকলের উচ্চে। অবুলফজল লিখিয়াছেন, "গত সহস্র বৎসরে এমন গায়ক উৎপন্ন হয় নাই।" অবুলফজলের শব্দগুলি এইরূপ :—

میاں تان سین گوالیري-گویندہ-

درین هزار سال همچو او نشان ندهند

অবুলফজল-লিখিত এই রত্নমালাকে অনেকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখেন। কেন না, সাধুদের অথবা কবিদের তালিকাতে সেকালের কবিসম্রাট্ তপস্বিশ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের নাম নাই। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অবুলফজল সরকারী খাতা দেখিয়া এই সব ফৰ্দ্দ রচনা করিয়াছেন। সে সময়কার হিন্দু মুসলমান, সাধু, কবি, গুণী ইত্যাদি সকলেই রাজকোষ হইতে অল্পবিস্তর বৃত্তি পাইতেন। অবুলফজল সেই বৃত্তি-ধারীদের ফর্দ্দ দিয়াছেন মাত্র। যাহারা কখনও দরবারে আসে নাই বা বৃত্তি স্বীকার করে নাই, তাহাদের নাম নাই। অবুলফজলের তালিকাতে যেমন তুলসীদাসের নাম নাই, সেইরূপ স্বামী হরিদাসেরও নাম নাই, অথচ উঁহাদের অপেক্ষা অনেক নগণ্য সাধু ও কবিদের নাম আছে। স্বামী হরিদাস ও তুলসীদাস সহস্র চেষ্টাতেও প্রলুব্ধ হইয়া দরবারে আসেন নাই।

এই সময়ে রামতনু তানসেনের এত আয় হইল যে, তিনি সামন্ত রাজাদের মত সেবক-সেবিকাবেষ্টিত হইয়া

প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যেরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, সেইরূপ মুক্তহস্ত দাতা ছিলেন। তাঁহার ব্যয়ে বহু গায়ক বাদক ও ঐ সকল বিদ্যার বিদ্যার্থী প্রতিপালিত হইত। তিনি স্বয়ং যেমন গুরুর আশ্রমে বাস করিয়া কৃতী হইয়াছিলেন, সেইরূপ একটি সঙ্গীতের বিদ্যালয় আপনার গৃহে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে দেশ-দেশান্তরের বিদ্যার্থীরা আসিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করিত।

সেকালে গায়ক ও কবিরা কিরূপ ধন পাইত, তাহার উদাহরণ যেমন তানসেনের জীবনীতে পাওয়া যায়, তেমন আর কোথায়ও দেখা যায় না। একবার চুরাগড়ের রাজা রামচন্দ্র কার্য্যোপলক্ষে রাজধানী আগরাতে আসিয়াছিলেন [১৫৮৩ঈ]। এই রাজা পূর্ব্বে বীরবরের প্রতিপালক ছিলেন, পরে বীরবর সম্রাটের সেবাতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক বদাউনী তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, রাজা রামচন্দ্র এক রাত্রি তানসেনের গান শুনিয়া এমন মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে এক কোটি টাকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

অকবরের সময়ে কবি ও গায়কদের যেরূপ সম্মান ও আয় ছিল, তাহার নানা গল্প প্রচলিত আছে। অকবরের সভাতে হিন্দী বা পার্সি ভাষার কবির নিম্নতম পুরস্কার পাঁচ ছটাক সোনা ছিল। তবে, অকবরের সময়ের সেরের ওজন আধুনিক ওজনে ৫২ ভরি ২ মাশা ২ রতি ছিল,

অতএব পাঁচছটাক এখনকার ১৭ ভরি হইত। ঊর্দ্ধতম পুরস্কারের সীমা ছিল না। অকবরের সেনাপতি ও একজন প্রধান সামন্ত, অবদুল রহীম খানখানা স্বয়ং কবি ও কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার কবিদের প্রতি লক্ষ টাকা দানের অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি কবি গঙ্গকে একটি ছয়পদী কবিতার পুরস্কার ৩৬ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। অকবরের প্রিয় সভাসদ রাজা বীরবর কবি কেশবদাসকে একটি ছয়পদী কবিতার পুরস্কার ছয় লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী দুই রাজত্ব কালে অর্থাৎ [জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহাঁর সময়ে] পুরস্কারের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়িয়াছিল, কিন্তু অওরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি সঙ্গীতের ঘোর বিরোধী ছিলেন, রাজসভাতে কবিদেরও আদর ছিল না। তবে, রাজপুত্রগণ ও সামন্তগণ তাঁহাদের সম্মান ও পোষণ করিতেন। অওরঙ্গজেবের সময়ে কবিভূষণ ত্রিপাঠী নামক আধুনিক কানপুরের কাছে ত্রিবিক্রমপুর [টিকওয়াঁপুর]-নিবাসী ব্রাহ্মণ হিন্দীভাষার কবি দাক্ষিণাত্যে মহারাজ শিবাজীর কাছে থাকিতেন। একবার হৃষীকেশের কাছে একজন তীর্থযাত্রী হিন্দু নরপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, রাজা কবিকে একটি হাতী ও এক লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কবি বলিলেন, আমি জীবনে এত হাতী ও এত টাকা পাইয়াছি যে, তীর্থ করিতে আসিয়া দান না করিয়া, সামান্য

এক লক্ষ টাকার জন্য হাত পাতা আমি অন্যায় বিবেচনা করি।

রামতনু তানসেনের সঙ্গীত সম্বন্ধে এত উপকথা প্রচলিত আছে যে, সেগুলি সংগ্রহ করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। একদিন সম্রাট্ অকবর নৌকায় করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া, নগর হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে এক নিবিড় জনমানবহীন বনমধ্যে তানসেনের গান শুনিতে পাইলেন। তিনি নৌকা ছাড়িয়া নিঃশব্দে তানসেনের কাছে গিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। তানসেন নির্জ্জন গভীর বনে একা বসিয়া গান করিতেছিলেন। তিনি আপনার গানে এমন মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সম্রাটের আগমন জানিতে পারেন নাই। গান শেষ হইলে সেইরূপ নিঃশব্দে সম্রাট্ আপনার নৌকাতে ফিরিয়া গেলেন। পর দিবস, রাজসভাতে তানসেনকে বলিলেন, "গত কল্য গভীর বনে তোমার যেমন গান শুনিয়াছি, তেমন গান সভাতে বসিয়া শুনিতে পাই না কেন? তুমি কি ইচ্ছা করিয়া এখানে প্রাণ খুলিয়া গান গাও না?" তানসেন উত্তর করিলেন "তাহা নহে, জাহাঁপনাহ্! গানের উৎকর্ষ শ্রোতার উপর নির্ভর করে, আমি যখন সভাতে বসিয়া গান করি, তখন আমার শ্রোতা দিল্লীপতি ভারতসম্রাট্, কিন্তু কাল যখন গভীর বনে বসিয়া গান করিতেছিলাম, তখন আমার শ্রোতা ছিলেন স্বয়ং জগৎপতি রব-উল-আলমীন

[ইহ ও পরকালের সম্রাট্], গানও সেই অনুপাতে ভাল বা মন্দ হইতেছিল।" অকবর এই উত্তর শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও যথাযোগ্য পুরস্কার দিলেন।

ইস্‌লাম ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে সঙ্গীত করা বা শ্রবণ করা পাপ বলিয়া গণ্য, সেই জন্য গোঁড়া মুসলমানরা গান শুনেন না। সূফী ধর্ম্মমতে গান গাহিয়া অর্থাৎ ভজন করিয়া উপাসনা করিতে হয়। গোঁড়া মুসলমানেরা এই ভজনকেও নিন্দা করেন ও সূফীদের কাফের বলেন। অকবরের প্রিয় সভাসদ ভ্রাতাদ্বয় কবি ফৈজী ও অবুলফজলের পিতা শেখ মোবারক একজন উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, বিদ্বান ও তাপস ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম-উপদেশ ও দীক্ষা দিতেন। তাঁহার অনেক দীক্ষিত শিষ্য ছিল। তিনি আপনার ছাত্র ও শিষ্য-গণকে গান শুনিতে বা গানের সভাতে যাইতে কঠোরভাবে নিষেধ করিতেন। পথ হাঁটিবার সময়ে কোনও স্থানে গান হইতেছে জানিতে পারিলে সে পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথে যাইতেন, পথ ত্যাগ করিতে না পারিলে সে অংশটুকু অতি শীঘ্র হাঁটিয়া অতিক্রম করিতেন। পথ হাঁটিবার সময়েও কর্ণ-কুহরে যাহাতে সঙ্গীতের শব্দ প্রবেশ না করে, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। একদিন কথা-প্রসঙ্গে অকবর তাঁহাকে বলিলেন, "আমার কাছে এমন গায়ক আছে যে, তাহার গান একবার শুনিলে আপনি আপনার মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। আমি তানসেনকে

আপনার কাছে পাঠাইব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া একদণ্ড কাল [২৪ মিনিট] তাহার গান শুনিয়া আমাকে বাধিত করিবেন।” সঙ্গীত-বিদ্বেষী হইলেও মোবারক অস্বীকার করিতে পারিলেন না। একদিন মাত্র একদণ্ড তানসেনের গান শুনিয়া, তাহার প্রভাবে তিনি এমন সঙ্গীতভক্ত হইয়া পড়িলেন যে, (ঐতিহাসিক বদাউনী লিখিয়াছেন) তিনি বৃদ্ধাবস্থায় মাসিক ৮০,০০০ আশী হাজার টাকা ব্যয় করিয়া গায়ক-গায়িকা-দল নিযুক্ত করিয়াছিলেন ও এক মুহূর্ত্ত সঙ্গীত ছাড়া থাকিতে পারিতেন না। এখানে সঙ্গীতের, বিশেষতঃ তানসেনের গানের প্রভাব এত বেশী যে, গল্পটি বিশ্বাস করিতে বেগ পাইতে হয় না।

রামতনুর হরিদাস স্বামীর আশ্রম ত্যাগ করিবার কিছু পূর্ব্বে শুকসেন বা সুখসেন নামক কোনও রাজবংশোদ্ভব যুবক স্বামীজীর কাছে প্রায়ই আসিত ও সঙ্গীত ও বীণাবাদন শিক্ষা করিত। এই শুকসেন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তবে কোন্ দেশের, কোন্ রাজবংশীয় ও বৃন্দাবনে কেন আসিল, তাহা জানা নাই। এ সময়ে স্বামীজীর বয়স অনেক বেশী হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, তখন তাঁহার বয়স তিন শত বৎসরের কম নহে কিন্তু তিনি তখনও বেশ কর্ম্মঠ ছিলেন। রামতনুর রাজধানী প্রয়াণের অল্পকাল পরে স্বামীজী সাধনোচিত উত্তম ধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন। তখন শুকসেন বাধ্য হইয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন ও নানাস্থানে

ঘুরিতে ঘুরিতে দিল্লী আসিলেন। রামতনুর সহিত অভিষেকের উৎসব কালেই মহম্মদ গওসের সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। উভয়েই সঙ্গীত বিদ্যাতে পারদর্শী, সেই জন্য আকৃষ্ট হইলেন। মহম্মদ গওস বীণাবাদনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রামতনু কিছু শিক্ষা করিবার অবসর পাইলে ছাড়িতেন না। তিনি মহম্মদ গওসের কাছে বীণাবাদন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। শুকসেন রামতনুর সহিত মহম্মদ গওসের বাড়ী যাইতেন ও সকলে বীণাবাদনে আনন্দভোগ করিতেন।

ক্রমে রামতনু মহম্মদ গওসের বা তাঁহার বংশীয় কোনও কন্যার প্রতি আসক্ত হইলেন ও ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। রামতনু ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, ললিতা সখীর অবতার হরিদাস স্বামীর মত মধুর প্রেমের উপাসক বৈষ্ণব ভক্তের শিষ্য হইয়াও মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বিনী কামিনীকে কেন বিবাহ করিলেন, তাহার বিশ্বসনীয় কারণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে কেবল স্ত্রীর জন্যই ইস্‌লাম স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইস্‌লাম স্বীকার করিবার পরও তাঁহার বংশে হিন্দু আচার প্রতিপালিত হইত। সেকালে কবি ও গুণিসমাজে গুণের আদর বা সম্মান করিতে গিয়া মুসলমান রমণীর সহিত প্রণয়, পরে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া বিবাহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। কবিদের মধ্যে

আলম ও শেখের গল্প প্রসিদ্ধ। আলম প্রথমে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব হিন্দী ভাষার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ছিলেন। একদিন একটি কবিতার পাদপূরণ করিতে না পারিয়া কবিতাটি এক কাগজে লিখিয়া সেকালের অভ্যাসমত মাথার পাগড়ীতে গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে, শেখনাম্নী এক রংকারিণীকে ঐ পাগড়ী রং করিতে দিয়াছিলেন। পাগড়ী রং হইয়া ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন, তাঁহার কবিতার পাদ পূর্ণ করা হইয়াছে। তিনি কবির প্রতি আকৃষ্ট হইলেন ও কিছুদিন পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শেখকে বিবাহ করিলেন। ইহার পর তুজনে মিলিয়া কবিতা লিখিতেন ও আলমশেখ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামতনুও এইরূপে কোন বিশেষ গুণে আকৃষ্ট হইয়া মুসলমান রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি বিবাহের পর মিঞা তানসেন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। মহম্মদ গওসের সঙ্গগুণে কিম্বা অন্য কোন কারণে শুকসেনও ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ও বীণাবাদক বিলাস খাঁ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। কয়েক বৎসর পরে মহম্মদ গওসের মৃত্যু হইলে বিলাস খাঁ তানসেনের সহিত সঙ্গীতচর্চ্চা ও বীণাবাদন অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তুই প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব হইল।

ইতিহাসে একজন শেখ মহম্মদ গওস গোয়ালিয়ারির উল্লেখ পাই। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল হমীদউদ্দীন। হজ

করিয়া আসিবার পর হইলেন হাজী হমীদউদ্দীন। তিনি ইরাণের প্রসিদ্ধ সাধু শেখ বায়জীর বস্তামী স্থাপিত সিলসিলা শত্তারীয়ার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধক ছিলেন। চুনারের কাছে এক গুফাতে বার বৎসর ফল মূল আহার করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন ও সূফী সম্প্রদায় হইতে "গওস আলম" উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার অগ্রজ শেখ ফুল (বা বহলূল) উত্তর ভারতে সাধকরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। শেখ ফুল হুমায়ুঁ বাদশার গুরু ছিলেন। হুমায়ুঁর ছোট ভাই মির্জা অসকরী তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। গওস সূরশাহী সম্রাট্‌দের সময়ে আগরা হইতে গুজরাটে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হুমায়ুঁর দ্বিতীয় বার রাজ্যলাভ হইলে তিনি আবার আগরায় আসেন। হুমায়ুঁর মৃত্যুর সময়ে অকবরের বয়স ১৩ বৎসর তিন মাস সাত দিন। গওস অকবরকে দীক্ষা দিয়া আপনার ক্ষমতা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া মন্ত্রী বেরম তাঁহাকে আড়াই লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়ের জায়গীর দিয়া গোয়ালিয়ারে থাকিতে বাধ্য করিলেন। বেরমের মৃত্যুর পর তিনি আবার আগরাতে আসিয়া অকবরকে দীক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হয়েন নাই। তিনি ৯৭০ হিঃ [১৫৬৩ঈ] আশী বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেন। তাঁহার গোর গোয়ালিয়ারে আছে। এই ইতিহাসের মহম্মদ গওস ও গল্পের মহম্মদ গওস এক ব্যক্তি কি না, নিশ্চয়রূপে বলা সম্ভব নহে।

কালে রামতনুর তিনটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হইয়াছিল। রামতনু তানসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্রাট্ তানতরঙ্গ খাঁ উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম অবুলফজল-রচিত আইন-অকবরীতে গায়কদের তালিকাতে আছে। অন্য দুই পুত্রের নাম সুরৎসেন ও তানরস; তাঁহাদের নাম আইন-অকবরীতে নাই। তাঁহার কন্যা বিবাহ-উপযুক্তা হইলে সম্রাট্ বিলাসখাঁর সহিত বিবাহ স্থির করিলেন। সেকালে নিয়ম ছিল যে, দরবারের অমীরদের পুত্র-কন্যার বিবাহ সম্রাট্ই স্থির করিতেন, অন্ততঃ সম্রাটের অনুমোদিত না হইলে বিবাহ হইত না। যদি কোন অমীর সম্রাটের অনুমতি না লইয়াই আপনার পুত্র বা কন্যার বিবাহ দিতেন, তবে তিনি শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হইতেন। যাহা হউক, বিলাসখাঁ ও তানসেনের কন্যার বিবাহ অতি সমারোহের সহিত হইল।

রামতনু তানসেনের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদের নাম পাওয়া যায়, তাহার পর আর নাম পাওয়া যায় না। বোধ হয়, বংশ এখন আর নাই, কিন্তু তাঁহার কন্যার ও বিলাসখাঁর বংশ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তানসেনের বংশে বাহাদুরসেন, অমৃতসেন ও রহীমসেন বোধ হয় শেষ বংশধর ছিলেন। বাহাদুরসেন কিছুকাল বিষ্ণুপুর রাজদরবারে বাস করিয়াছিলেন, তাহার পর আর সন্ধান পাওয়া যায় না। বিলাসখাঁ ও তানসেনের কন্যার বংশে বোধ হয় একমাত্র

মহম্মদ আলী খাঁ (বা ননকু) কিছুকাল পূর্ব্বে গিধৌরের রাজার সভাতে ছিলেন। এক্ষণে পরলোকপ্রাপ্ত।

সঙ্গীত-সমাজে প্রবাদ আছে যে, তানসেনের বংশধরেরা গৌড়ীয় বাণীতে, ও বিলাসখাঁর বংশধরেরা খণ্ডার বাণীতে গান করিয়া থাকেন।

দুর্ঘটনা

একবার সম্রাট্ অকবর তানসেনকে বলিলেন, "তোমার মুখে দীপক রাগের বর্ণনা শুনিয়াছি, কিন্তু কখনও গান শুনি নাই, আজ এই সভাতেই দীপকে গান কর, শুনিব।" তানসেন এই রাগটি আপনার গুরুর কাছে দূরে অন্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকা কালে অর্থাৎ গোপনে অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার গুরুদেব বোধ হয় জ্ঞান-চক্ষুতে ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তজ্জন্যই সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, যে এরাগ বৃহৎ জলাশয় বা নদীতীরে বসিয়া আলাপ করিও, নতুবা গায়কের শরীর অন্তরের উত্তাপে জ্বলিয়া ওঠে। আজ সে-কথার পরীক্ষার সময় উপস্থিত। অকবর বাদশা এই অদ্ভুত উক্তির প্রত্যক্ষ ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

রামতনুও শৈশবাবস্থা হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে মহাপুরুষ কবীর সাহেবের এই উক্তিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কবীর সাহেব বলিয়াছেন ঃ—

করম গতি টারে নহিঁ টরী।
পাণ্ডব জিন্‌কে আপ সারথী, তিন পর বিপত পরী!
কহৎ কবীর শুনো ভাই সাধো, হোনী হোকে রহী॥

রাজসভাতে ছোট-বড় কোন প্রকার জলাশয় ছিল না। ফল কি হওয়া সম্ভব, জানিয়াও রামতনু কোন প্রকার আপত্তি করিলেন না। তিনি আপনার পতিগতপ্রাণা পত্নীকে আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ পাঠাইয়া ঐ রাগে গান আরম্ভ করিলেন। তাহার ফল ফলিতেও বেশী দেরী হইল না। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই সঙ্গীত-গগনের অদ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক চিরকালের মত অস্তমিত হইয়াছে, সেখানে কেবল ধূলিময় কায়াটি পড়িয়া ছিল। কিন্তু বিদ্যার পরীক্ষা তথাপি শেষ হয় নাই। তানসেনের জামাতা বিলাস খাঁ সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী শিষ্য, সন্তান-গণ মধ্যে জ্যেষ্ঠ রূপে শববহন ও সৎকার করিবার অধিকার দাবী করিলেন। কিন্তু তানসেনের পুত্রগণ সে দাবী গ্রাহ্য করিলেন না। উভয়ে সম্রাটের কাছে বাদী হইলেন। সম্রাট্ আদেশ করিলেন, শবের নিকট সকলে একে একে গান কর, যাহার গানে শব নড়িবে, কোনরূপ ইঙ্গিত করিবে বা অলৌকিক কিছু দেখা যাইবে, সে-ই শব বহন করিবার

অধিকারী বিবেচিত হইবে। অতএব শবের কাছে আবার গুণের পরীক্ষা হইতে লাগিল। সকলেই গান করিলেন, কিন্তু কেবল বিলাস খাঁর সঙ্গীতে কোনও প্রকার অলৌকিক ঘটনা হইয়াছিল, আর কাহারও গানে হয় নাই। অতএব তিনিই প্রধান সৎকারক রূপে শব বহন করিতে অনুমতি পাইলেন। এ সময়ে বিলাসখাঁ দরবারী টৌড়ী রাগে "মেরে তো অল্লাহ নাম কো আধার" গান গাহিয়াছিলেন। এ গানখানি তানসেনই তাঁহাকে পূর্ব্বে দান করিয়াছিলেন। সঙ্গীত-সমাজে ইহাও প্রবাদ আছে যে, কন্যার বিবাহের সময়ে তানসেন আপনার জামাতাকে একশতটি রাগ ও প্রত্যেক রাগের চারখানি গান যৌতুক দিয়াছিলেন। সে রাগ ও গান তিনি জীবনে আর গান নাই।

তানসেনের আগরাতে মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ-মত তাঁহার শব গোপাচলে অর্থাৎ গোয়ালিয়রে লইয়া গিয়া সমাহিত করা হইয়াছিল। তাঁহার গোর এখনও ভাল অবস্থাতে আছে।

অকবরের রাজসভার এক উজ্জ্বল রত্ন, তাঁহার বাল্যাবস্থার শিক্ষক ও মন্ত্রী বেরম খাঁর একমাত্র পুত্র নবাব অবদুলরহীম খানখাঁনা হিন্দী ভাষার একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। তিনি তানসেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

বিধনা ইয়হ জিয় জানিকে, সেষহি দিয়ে ন কান।
ধরা মেরু সব ডোলি হৈঁ তান সেনকে তান।

অর্থ ঃ—[পুরাণের বর্ণনা অনুসারে শেষ নাগের মাথায় পৃথিবী রহিয়াছে, নাগ একটু মাথা নাড়িলেই ভূমিকম্প হয়। শেষ নাগের কান নাই] বিধাতা শেষ নাগকে কর্ণহীন করিয়াছেন। কেননা তাহার কান থাকিলে তানসেনের তান শুনিয়া মাথা না নাড়িয়া থাকিতে পারিত না ও মাথা নাড়িলেই তাহার মাথায় স্থিত পৃথিবী উল্টাইয়া পড়িত॥